প্র. না. বির

নীরস গল্প-সঞ্চয়ন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৭

দাম : সাড়ে তিন টাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ও

শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক

আশীর্ব্বাদভাজনেষু—

ন-ন-লৌ-ব-লিঃ

স্বর্গের নন্দন বনে পারিজাত বৃক্ষতলে আজ বড় ভিড়। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকল বয়সের দেবতা সমবেত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম স্বর্গে কেহ বৃদ্ধ হয় না; বুঝিলাম স্বর্গ সম্বন্ধে যে সব গুজব শোনা যায়, তার সবগুলি সত্য নয়। কিসের জন্য এ জনতা? দেবতারা কি পারিজাত পুষ্প চয়নের জন্য আসিয়াছেন? না স্বর্গীয় মধুচক্র ভাঙিবার জন্য কোন দুরন্ত দেব-শিশু বৃক্ষে উঠিয়াছে সকলে তাহাকে দেখিতেছে? কিংবা ও সব কিছুই নহে, পারিজাতের ডালে একখণ্ড কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। সেই বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য এই ভীষণ দৈব জনতা।

তবে কি স্বর্গেও বেকার-সমস্যা দেখা দিল নাকি? অসম্ভব নয়! স্বর্গের সনাতন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটি বাড়িয়া তেতাল্লিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে; তারপরে মন্দাকিনীতে তো বন্যা লাগিয়াই আছে। বিশেষ দেবদৈত্যের সেই মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বর্গের পরমার্থিক অবস্থা (স্বর্গের অর্থকে পরমার্থ বলে) দিন দিন খারাপ হইয়াছে; স্বর্গের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।

বিজ্ঞাপনখানার কাছে যাইবার জন্য বড়ই ঠেলাঠেলি পড়িয়া গিয়াছে, ব্যবহারের বেলায় দেখিলাম দেবতারা মানুষেরই মত, হুড়াহুড়িতে কাহারো উত্তরীয় ছিঁড়িল, কাহারো চুল ছিঁড়িল; এক ব্যক্তি মরিবার সময় 'নেকটাইয়ের' মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই 'নেকটাই' ধরিয়া অন্য সকলে তাহাকে সরাইয়া দিল; একজন বৃদ্ধের ট্যাক হইতে অমৃতের ডিবা খোয়া গিয়াছে বলিয়া সে বড়ই হৈ চৈ করিতে লাগিল; সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন সিনেমায় চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট করিবার দৃশ্য। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনখণ্ড সমীরণে মৃদু মন্দ দুলিতেছে; সেখানা এই রকমের :—

কর্মখালি

আবশ্যক—ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-এর জন্য তিন জন সাধু, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী

কর্ম্মী চাই। সত্বর হাতে লিখিয়া সার্টিফিকেটের নকলসহ কত বয়স, কোন্ জেলায় বাড়ী, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতাসহ দরখাস্ত করুন। মাসিক বেতন গুণানুসারে।

বি: দ্র:—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে ; কোনরূপ ব্যক্তিগত ক্যানভাস চলিবে না।

অস্পষ্ট স্বাক্ষর—ন-ন-লৌ-ব-লি: প্রধান কর্ম্মসচিব।

বিজ্ঞাপনখানা একটু বিস্তারিত ভাবে জ্ঞাপন করা উচিত। ন-ন-লৌ-ব-লি: আর কিছুই নহে—নন্দন নরক লৌহবর্ত্ম লিমিটেডের সংক্ষিপ্তরূপ। সকলেই জানেন, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দূরত্ব অনেক, যাতায়াতের পথ-ঘাট ভাল নয়। কিছুকাল হইল স্বর্গে ডিমোক্রেসির প্রভাবে এই দুই স্থানের মধ্যে যোগ করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ হাজার জোড়া কিন্তু কান মাত্র দুটী! তিনি কোন আবেদন-নিবেদন কানেই তোলেন না ; দেবগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে এমন সময়ে একদিন মর্ত্ত্যের সর্ব্বাধিক প্রচারিত একখানি দৈনিক পত্র সেখানে গিয়া পড়িল। উহা পাঠ করিয়া দেবগণ আবার কোমর কসিয়া লাগিয়া গেল। ফলে স্বর্গের অমৃতের দোকানে পিকেটিং হইল ; উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি মহিলাগণ সভাগৃহের চেয়ার টেবিল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গের কয়েকটী শিশুদেবতা ঢিল ছুড়িয়া স্বয়ং ইন্দ্রের খাস কামরার কাঁচ ভাঙ্গিয়া দিল। আর সকলকে ছাপাইয়া স্বর্গের বিখ্যাত কবি (ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ট্রেঞ্চ খনন করিয়াছিলেন) নানা ভাষার খিঁচুড়ি করিয়া এমনি সিংহনাদ করিলেন যে সপারিষদ ইন্দ্রের টনক নড়িল। নন্দন নরকের মধ্যে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইল।

নন্দন নরকের যোগস্থাপনের পর হইতে স্বর্গের দ্বারপালের কাজ বাড়িয়া গেল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক নরক হইতে আসিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্বর্গে চুরি, খুন, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দৈনিকের সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিলেন। ফলে কয়েকজন অতিরিক্ত দৌবারিক নিযুক্ত হইল ; কিন্তু তাহারা ঘুষের বশ, সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। তখন ন-ন-লৌ-ব-লি:-র কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন এমন সব ব্যক্তিকে দ্বারবান করিতে হইবে যাহারা ঘুষের বশবর্ত্তী নয়, অর্থাৎ

সাধু, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী…ইত্যাদি এইরূপ কয়েকজন লোক চাহিয়া ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

স্বর্গের ঘরবাড়ী, রাস্তা-ঘাট, প্রাচীরগাত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী পরিল; সম্ভব অসম্ভব সব স্থানে বিজ্ঞাপন দেখা দিল। যেন এক রাত্রের মধ্যে স্বর্গীয় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া চর্ম্মরোগ দেখা দিল। ইন্দ্রের রথে ঐরাবতের পিঠে, উচ্চৈঃশ্রবার কণ্ঠে, নারদের ঢেঁকিতে সর্ব্বত্র কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন। স্বর্গে বড় হৈ চৈ লাগিয়া গেল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃ হেড আফিসে রাশি রাশি দরখাস্ত আসিতে লাগিল, যে কয়জন কর্ম্মচারী ছিল তাহারা আর পারিয়া ওঠে না। শেষে এই দরখাস্তের জন্য একটি নূতন বিভাগ খোলা হইল এবং কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানার দুইজন সুদক্ষ কেরাণীকে বিনা নোটিশে ট্রামচাপা দিয়া 'রিকুইজিশন' করা হইল। যথা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে দরখাস্ত বিবেচনা করিবার জন্য কমিটী বসিল। তিন জন কর্ম্মচারীর জন্য একলক্ষ দরখাস্ত পড়িয়াছে। স্বর্গের বেকার-সমস্যা বাংলা দেশের অপেক্ষাও তীব্রতর!

॥ ২ ॥

'সিলেকশন' কমিটী সাত দিন অধিবেশন করিয়া বারখানা দরখাস্ত বাছিয়া বাহির করিল। বার জনই প্রসিদ্ধ লোক, পৃথিবীতে এককালে তাহাদের সচ্চরিত্র পরিশ্রমী যুবক বলিয়া খ্যাতি ছিল।

কে সেই সৌভাগ্যবান দ্বাদশ জন? পাঠক শ্রবণ করুন—সক্রেটিস, সিজার, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, লর্ড কিচেনার, যুধিষ্ঠির, জোয়ান অফ্ আর্ক, আব্রাহাম, নেবুকার্ডনেজার, হাউপ্টম্যান ও মার্টিন লুথার! এই বার জনকে লইয়া কর্তৃপক্ষের মহা মুস্কিল হইল, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখেন। প্রশংসাপত্রে কম যায় না, প্রশংসাপত্র পড়িয়া লিণ্ডবার্গের পুত্রহন্তা হাউপ্টম্যানকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া মনে হয়। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন, যে তিন জন সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম বেতনে কাজ করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগকে লওয়া হইবে। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির নিম্নতম বেতনে রাজী হইল—অন্য সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ইহাদের প্রশংসাপত্রের জোর বড অল্প নয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম হইতে ভাণ্ডারকর পর্য্যন্ত অনেকের সার্টিফিকেট ভরিয়া দিয়াছে। সে মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে, কেবল 'ইতি গজের' ইতিহাসটী চাপিয়া গিয়াছে। স্বর্গে গিয়া যুধিষ্ঠিরের কিছু বুদ্ধি হইয়াছে মনে হয়, ভীষ্ম লিখিয়াছে বেচারী সারা জীবন কষ্ট পাইয়াছে, এখন একটী চাকুরী পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বুদ্ধ ত্রিপিটক হইতে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। অশোক, বিম্বিসার, রীজডেভিডস্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, এমনটী আর পাইবে না।

যীশুখৃষ্টের প্রশংসাপত্রই সব চেয়ে চমকপ্রদ। কারণ ও বিদ্যায় ইউরোপীয়েরা শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং পন্টীয়াস পাইলেট লিখিয়াছে, আমি ভুল করিয়া লোকটাকে বিচার ছলে খুন করিয়াছি। সেজন্য এখন অনুতপ্ত। বার্ণাডশ বলিয়াছে—যীশুই প্রথম সোসালিষ্ট, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। চেষ্টারটন লিখিয়াছে যীশুই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী, যদিও তাহা অধ্যাত্ম সাম্রাজ্য, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। যীশু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া একখানি পকেট সংস্করণের বাইবেল দরখাস্তের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

এক দিন স্বর্গের অধিবাসীরা দেখিল ন-ন-লৌ-বি-লিঃ তিন জন নব নিযুক্ত দৌবারিক কোম্পানীর উর্দ্দি পোষাক ও টুপি পরিয়া ষ্টেশনের তিন দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, দুর্ব্বৃত্তগণ চিন্তিত হইল, স্বর্গের পুরুষেরা গ্রন্থি ও মেয়েরা নীবী সম্বন্ধে স্বস্তি অনুভব করিল।

সেদিন সকালে নন্দন-নরক মেল যথা সময়ে নন্দন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। যাত্রীরা পৃথিবীর অভ্যাস ভুলিতে পারে নাই। সকলের মুখেই একটা গেল গেল ভাব, যাহাদের স্বর্গে প্রবেশের টিকিট ছিল, তাহারা নিজের নিজের বোঝা (পুণ্যের বোঝা) লইয়া সগৌরবে দ্বার অতিক্রম করিল। কেবল একটী লোক সন্দেহজনক ভাবে আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল। লোকটীর হাঁটুলম্বী পাঞ্জাবী, পরণে লুঙি, দুই পায়ে দুই ধরণের নাগরাই জুতা, আর কানে গোঁজা অর্দ্ধদগ্ধ একটী বিড়ি। যাত্রীরা চলিয়া গেল, ছকু খানসামা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল—টিকিট্? ছকু ট্যাঁকে (যুধিষ্ঠিরের নয় নিজের)

হাত দিয়া একটী সিকি বাহির করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চোখ মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি দাদার রেট কত করে? যুধিষ্ঠির অবাক হইয়া বলিল, রেট! টিকিট কই? ছকু ঘুঁষ-দাতাদের চিরপরিচিত সেই হাসি হাসিয়া বলিল—বলি মোচড় দিয়ে কিছু বেশী নেবার চেষ্টা, আচ্ছা না হয় দু' ছিকি (সিকি) হবে? অপমানিত যুধিষ্ঠির সক্রোধে হিন্দিতে বলিল, নেই হোগা।

তখন ছকু বুদ্ধের নিকটে গিয়া পুনরায় ঐ রূপ বলিল, বুদ্ধ সব শুনিয়া বিশুদ্ধ পালি ভাষায় বলিল, "অসম্ভব।" এবার ছকু খৃষ্টের নিকটে গিয়া একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, প্রণামান্তে স্বর্গে প্রবেশের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক আরম্ভ করিল, বেচারা যীশু স্বর্গে আসিবার পর হইতে ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুযোগ পায় নাই, তর্ক করিতে করিতে সে যেমনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি ছকু এক ছুটে দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে বেশী দূরে যাইতে পারিল না, যীশু তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল, অপর হাত দিয়া ছকু দরজার রেলিং ধরিল। যীশু তাহাকে টানে, সে কিছুতেই রেলিং ছাড়ে না। তাহার দেহের খানিকটা স্বর্গের মধ্যে খানিকটা বাহিরে। যীশুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া দুই জনে তাহার দুই পায়ে ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন উঃ কি টানাটানি? ছকু এক হাত দিয়া রেলিং ধরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, আর যীশু, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির তাহার দুই পা ও এক হাত ধরিয়া প্রাণপণে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। বাপ রে ছকুর এক হাতে কি জোর! যে হাতে মর্ত্ত্যে থাকিতে সে বহু লোকের গ্রন্থিচ্ছেদন করিয়াছে, পকেটসন্ধান করিয়াছে, সিঁধকাঠি চালনা করিয়াছে, সে হাত আজও তাহার বেহাত হয় নাই। যীশু, বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া দরদর করিয়া ঘামিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জড় হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, কোম্পানী এত দিনে বিশ্বস্ত লোক পাইয়াছে বটে। কিন্তু ব্যাপারটার কোনো মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া দর্শকদের মধ্য হইতে একজন (বোধহয় বাঙালী) বলিয়া উঠিল, কাতুকুতু দিন মশায়, কাতুকুতু দিন। ইহা শুনিয়া যীশু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছকুর বগলে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল, অমনি কোথায় গেল ছকুর মরীয়া ভাব! কোথায় গেল ধর্ম্মবীরকে পরাজয়কারী বাহুর বল, সে হাসিতে হাসিতে রেলিং ছাড়িয়া দিল। তখন তিন জনে

মিলিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহাতে ছকু মোটেই রাগিল না, সে হাত দিয়া অবিন্যস্ত পাঞ্জাবী ও টেরি ঠিক করিতে করিতে কান হইতে আধপোড়া বিড়িটী খুলিয়া যীশুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাচিস হ্যায়? যীশুর নিকটে অনুতাপের অনল ছাড়া আর কোন প্রকার আগুনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে হতাশ ভাবে সরিয়া পড়িল।

ছকু সরিয়া পড়িলে, যীশু অন্য দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই, লোকটা একটা সিকির (ছিকি) কথা কি বলছিল? বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির এক সময়ে রাজার ছেলে ছিল, কাজেই সংসারের রীতিনীতি কতক কতক তাহারা জানিত—তাহারা বলিল—উহাকেই বলে ঘুষ খাওয়া। যীশুর দিব্যদৃষ্টির উদয় হইল, সে বলিল—বটে, এতদিনে আমার বিশ্বাস হইতেছে, জুডাস বেটা আমাকে ধরাইয়া দিবার পূর্ব্বে ঘুষ লইয়াছিল। সেদিনের মত তাহাদের Duty শেষ হইল। তাহারা নিজেদের মেসে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালে পুনরায় নন্দন-নরক মেল নন্দনে আসিয়া থামিল। পুণ্যের বোঝায় পীড়িত যাত্রীরা স্বর্গে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের অন্যতম পঞ্চানন বাবাজী স্বর্গে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে খৃষ্ট তাহাকে বাধা দিল. পঞ্চানন বলিল, আমাকে নিষেধ কর কেন বাপু? আমি সারা জীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি, জীবনে এক পয়সা উপার্জ্জন করি নাই কেবল ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি; নিজের পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছি এবং পরের পঞ্চাশজন পত্নীকে বৈষ্ণবী করিয়াছি; ভিক্ষায় যে সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহার এক পয়সাও খরচ করি নাই—কিংবা দান করি নাই, স্বার্থ ছাড়া কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। অপরে মিথ্যা কথা বলিলে রীতিমত রাগিয়াছি; জীবনে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অভিনয় করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া তবেই চুরি করিয়াছি, পরের ধর্ম্ম ছাড়া কখনো নিজের ধর্ম্মের নিন্দা করি নাই. প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়াছি; গঙ্গাস্নান হইতে এখনি আসিতেছি। (বাবাজী সাঁতার দিয়া একটী নারিকেল ধরিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে) তবে কেন আমায় থামাও বাপু! খৃষ্ট বলিল—আপনার কথা ঠিক, স্বর্গে প্রবেশ করিবার আপনার সব গুণই আছে; আপনাকে আটকাই এমন কি সাধ্য? কিন্তু হাতের কাকাতুয়াটীকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। বাবাজী রাগিয়া উঠিল, কে তুমি বেল্লিক? কি নাম বট হে? খৃষ্ট বিনীত ভাবে

উত্তর দিল—খৃষ্ট! বাবাজী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, রামঃ ছিঃ ছিঃ, কি সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড-কারখানা! শেষে এ বেটা খ্রীষ্টানকে এরা দরজায় দাঁড় করাইয়াছে? এমন জানিলে শেষে কে স্বর্গে আসিত! ইহার চেয়ে আমার সনাতনপুরে আখড়া ছিল ভাল। আমার কমলমণি সেবাদাসীর বয়স কেবল হইয়াছিল ষোল। হায়! হায়!

বাবাজী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবার কাকাতুয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' বাবাজী হঠাৎ সেবাদাসীর শোক ভুলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—দেখিলে তো বাপু আমার কাকাতুয়াটী কেমন আধ্যাত্মিক পাখী। তার পর গলার স্বর একটু নামাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল - উর্ব্বশীকে দেখিতে কেমন? বলি বয়স কত?

'খৃষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আপনি পাখীকে আধ্যাত্মিক বলিলেন বটে, কিন্তু পশু পাখীর তো আত্মা নেই। মানুষের আত্মা পুণ্যের বলে স্বর্গে আসে, পশু পাখীর আত্মা না থাকায় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া?

গোলমাল শুনিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী সকলের পরিচয় লইল। তখন চার জনে মহা বিতর্ক বাধিল, মনুষ্যেতর প্রাণীর আত্মা আছে কিনা?

বাবাজী যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই:—মানুষের আত্মা যদি থাকে, অসভ্য ও বর্ব্বর কোল্ ভীল, সাঁওতালদের আত্মা আছে কিনা? ও যদি থাকে, তাদের নিয়ে যারা আছে বানর শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বনমানুষ তাদের আত্মা আছে কিনা? আর যদি বানর জাতির আত্মা না থাকে তবে তাদের উপরে অবস্থিত অসভ্য ও বর্ব্বরদের কেন থাকিবে? (বাবাজী ডারউইন মানে) খৃষ্টরা তিন জন নীরব। তখন বাবাজী বলিল, বাপু তুমিই না বলিয়াছ যে উষ্ট্রও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু ধনীরা পারে না, তবে? তারপর দেখ ইন্দ্রের হাতী আছে, ঘোড়া আছে, তারা কি পশু নয়? বিষ্ণুর গরুড় আছে সে পাখী নয়? আর আর বৈশ্বানরের বাহন ছাগ। এবার বাবাজীর চোখ একটু হাসিল। (হায়, এইরূপ হাসির বলেই সে নব নব সেবাদাসী সংগ্রহ করিয়াছে) বলিল—বলি বুঝলে তো?

বাবাজীর কথা শুনিয়া খৃষ্ট বুঝিল,—বাবাজীকে ঠেকাইবার আশা সফল হইবে না। সে অগত্যা বাবাজীকে পথ ছাড়িয়া দিল। দরজায় ঢুকিবার

সময় আধ্যাত্মিক কাকাতুয়া একটি তীক্ষ্ণ ঠোকর মারিয়া খৃষ্টের হাতে রক্ত বাহির করিয়া দিল। বাবাজী সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি সে কথার তো জবাব দিলে না। খৃষ্ট হাতের রক্ত চাপিতে চাপিতে বিরক্ত হইয়া বলিল—জানি কিন্তু বোলব না। বাবাজী উত্তর না পাইয়া বকিতে বকিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

খৃষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ততায় স্বর্গে অবাঞ্ছিত লোক প্রবেশ করিতে পারে না। স্বর্গে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া গেল। রেল কোম্পানীর সুনাম বাড়িয়া গেল, তাহারা ভাড়া দ্বিগুণ করিয়া দিল এবং কর্ম্মচারীদের মাহিনা অর্দ্ধেক করিয়া দিল কিন্তু কর্ম্মচারী তিন জনের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল! তাহাদের দিন যায়, কিন্তু রাত্রি যায় না।

॥ ৩ ॥

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন মন্দাকিনীর এক ঝুড়ি টাটকা ইলিশ মাছ আনিয়া বুদ্ধদেবের কাছে রাখিল। বুদ্ধদেব বলিল, আমি মাছ খাই না। সে বলিল, মাছ না খান ডিম খান, ওতে দোষ নাই, ডিমটা নিরামিষ। খৃষ্টকে একজন একটি সদ্যজাত গোবৎস ও এক ভাঁড় তাড়ি উপহার দিল। খৃষ্ট দয়ালু, না লইলে লোকটা দুঃখিত হয়, গ্রহণ করিল। আর একদিন আর একজন তাহার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিল, খৃষ্ট বলিল —ইহাকে কি ঘুষ বলে? সে জিভ কাটিয়া বলিল—কি সর্ব্বনাশ আপনাকে কি ঘুষ দিতে পারি? ইহা পান খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ।—গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই কি বল? লোকটা বলিল—কিছু না প্রভু! বাংলাদেশ নামে এক দেশ আছে, সেখানকার দারোগারা ঘুষের নাম শুনিলে রাগিয়া ওঠে, কারণ তাতে চাকরী যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পান খাইবার জন্য এমন অনেক কিঞ্চিৎ নেয়, দোষের হইলে ইংরেজের দারোগা এমন করিতে পারিত?

আর একদিন একজন যুধিষ্ঠিরের নিকটে সুবৃহৎ এক ডালা বোঝাই ফলমূল, তরকারী, ফুল (ফল ফুলের নীচে গোপনে মা দ্রৌপদীর জন্য একখানি ঢাকাই শাড়ী ও একজোড়া অনন্ত ও কানের দুল) উপস্থিত করিল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা ত ঘুষ। আধারবাহক আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—প্রভু না গ্রহণ করেন তো ক্ষতি নাই, কিন্তু ইংরেজের অপমান করিবেন না। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল—ইংরেজ কে?

লোকটা বলিল—আপনার পরে এখন যারা ভারতবর্ষের রাজা।

যুধিষ্ঠিব বলিল—তাহাদের কথা কি বলিতেছ? সে বলিল, ইংবেজেব হাকিম ঘুষ নেয় না, ডালা গ্রহণ কবে। যুধিষ্ঠিব নিশ্চিন্ত হইয়া ডালা গ্রহণ কবিল। বাসায় গিয়া যুধিষ্ঠিব দেখিল ফল-ফুলেব তলে শাড়ী-অলঙ্কার। বুঝিল ডালাব ইহাই নিয়ম। পবদিন আর এক জন ডালা আনিল, যুধিষ্ঠির প্রথমেই ফল-মূল তুলিয়া দেখিল—শাড়ী ও অলঙ্কাব আছে কিনা, না দেখিতে পাইয়া পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

আব একদিন বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রে এক ব্যক্তি কয়েকটী মোহব দান কবিল। বুদ্ধদেব করুণাব সুধাহাস্য জ্যোতি বিস্তাব কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—বৎস, ইহাকে কি উৎকোচ বলে না? লোকটা তাঁহাব পদধূলি গ্রহণ কবিয়া বলিল প্রভু, ইহাব নাম ভালোমানুষি। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা কবিল ভালোমানুষি লওয়া কি অপবাধেব? লোকটা ঈষৎ হাস্য কবিয়া বলিল, সে কি প্রভু! পৃথিবীতে আদালতেব কর্ম্মচাবী পেস্কাব প্রভৃতি মহাজনেব ভালোমানুষি ছাডা কোনই কাজ কবে না, ইহা গ্রহণে অপবাধ দূবে থাকুক, না কবিলেই মহাপাতক আদালতেব মহাজনদেব পুণ্য জীবনবাহিনী আপনি জানেন না বলিয়াই এমন কথা বলিয়াছেন।

শুনিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে কবপদ্ম তুলিয়া আশীর্ব্বাদ কবিল।

॥ ৪ ॥

এমনি কাবনা দিন যায়, বুদ্ধ, যীশু, যুধিষ্ঠিব ঘুষ গ্রহণ কবে না বটে, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে পান খাইবাব অর্থ, ডালা ও ভালোমানুষি আদায় কবে। শেষে এমন হইল যে, তাহাবা আব উহা না পাইলে ‘বনাযাইডি’ স্বর্গ-যাত্রীদেব পথ ছাডিয়া দেয় না। আব যাহাদেব টিকিট নাই, তাহাবা অনায়াসে কিছু কিছু দিয়া স্বর্গে অনধিকাব প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে স্বর্গেব দৌবাবিকত্রয় মোহব না পাইলে গ্রহণ কবিত না, কিন্তু কিছু কাল পবে টাকা, সিকি, কুমডো, লাউ, বেগুন লইয়া পথ ছাডিয়া দিতে আবম্ভ কবিল। স্বর্গে আবাব চুবি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপবাধেব সংখ্যা বাডিয়া গেল, স্বর্গেব পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় দৈনিকের সম্পাদক স্ত্রীব সঙ্গে ঝগডা কবিয়া পুলিশকে আক্রমণ কবিয়া কডা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃর কর্তৃপক্ষ পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ব্যাপার কি? এসব চোর ডাকাত ঢুকিতেছে কোন্ পথে! যে তিনটি দরজা আছে তাহাতে তিনজন বিশ্বস্ত কর্মচারী দণ্ডায়মান। তবে কি তাহারাই ঘুষ খাইতেছে? না না, তাহা কখনও সম্ভব নহে। প্রশংসাপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাইবেল, মহাভারত ও ত্রিপিটকে যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে ঘুষ খাইবার কথা কিছুতেই মনে হয় না। তবে কি? রেল-কোম্পানীর প্রধান ম্যানেজার স্থির করিলেন, এবার তিনি তিনজনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ব্যাপার কি?

পরের দিন নন্দন-নরক মেল আসিয়া পৌঁছিলে, ম্যানেজার চোরের ছদ্মবেশে (ধনী ম্যানেজারের পক্ষে চোরের বেশটাই হয়তো আসল) স্বর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল! যীশু তাহার পথরোধ করিয়া বিশুদ্ধ বাইবেলী ইংরাজীতে বলিল—তোমার টিকিট কোথায়? ছদ্মবেশী ম্যানেজার ভীত ভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিল, সিকি দেখিয়া যীশু রাগিয়া বলিল—আমি ঘুষ লইব না। কিন্তু লোকটা নেহাত চলিয়া যায় দেখিয়া আবার বলিল—তবে যদি পান খাইতে কিছু দাও, হাঁ সে স্বতন্ত্র কথা। মানেজার জিজ্ঞাসা করিল—তাহাতে কি স্বর্গে ঢুকিতে পারিব?

যীশু তাম্বুলবিহারী হাসি হাসিয়া বলিল—স্বর্গ তো দরিদ্রের জন্যই, তুমি কি বাইবেল পড় নাই? ম্যানেজার তাহাকে সিকিটা দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পর দিন আবার ম্যানেজার ট্রেণের টাইমে ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, টিকিট? লোকটা বলিল—টিকিট নাই তবে স্বর্গে প্রবেশের ইচ্ছা আছে।

বুদ্ধদেব স্পষ্টভাষী লোক, বলিল—দেখো বাপু আমি ঘুষ খাই না, তবে ভালমানুষি বলিয়া কিছু দিয়া থাকিলে লইয়া থাকি।

ম্যানেজার বলিল পয়সা তাহার কাছে নাই। বুদ্ধ রাজার ছেলে, ঊনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রাজবাড়ীতে ছিল, কাছারীতে খাজনা আদায়ের রীতি তার অজানা নয়, বিপদ কালে প্রজারা কোথায় টাকা রাখে সে জানে, সে লোকটার কাছা নাড়া দিলে টক করিয়া একটা সিকি পড়িল। বুদ্ধদেব তাহা তুলিয়া কানে গুঁজিয়া লোকটাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাও বৎস, তোমার স্বর্গে বাস অক্ষয় হোক।

তার পরদিন ম্যানেজার পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির তাহাকে দেখিয়া বলিল—দেখ বাপু তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি টিকিট তোমার নাই, আমি ঘুষ লই না কিন্তু আমি ডালা লই! ডালা কোথায়? তখন অনেক দরদস্তুর করিয়া ডালার বাবদ নগদ সাত সিকি পয়সা যুধিষ্ঠির আদায় করিয়া লইল। ম্যানেজার স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পর দিন ন-ন-লৌ-ব-লিঃর আফিসে ম্যানেজার সব কথা খুলিয়া বলিল। সভায় স্থির হইল যে, যীশু, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক। তিন জনেরই চাকরী গেল। তাহারা কোম্পানীর কোর্ত্তা, টুপি প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া মৌলিক গেরুয়া ও ঝুলি লইয়া পথে বাহির হইল। এখন কোথায় যায়, কি করে? এমন সময় দেখিল একদল বালক, বৃদ্ধ ও যুবক হারমোনিয়ম, খোল, খঞ্জনী লইয়া বাহির হইয়াছে, বন্যার জন্য ভিক্ষা করিতেছে তাহারা, দোতালার জানালার দিকে তাকাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে গাহিতেছে :—

মন্দাকিনীর বন্যাতে আজ
হন্যা দিল স্বর্গলোকে।
কোমর জলে দাঁড়িয়ে দেখ
খাচ্ছে খাবি কতই লোকে।
দাও জননী ছিন্নবাস
দাও জননী চালের বাশ
লক্ষ্মী দিল ছিন্ন শাড়ী,
সরস্বতী করুণ শ্লোকে।

স্বর্গের উত্তর বঙ্গে বন্যা আসিয়াছে।

ভিক্ষার ঝুলিতে চাল পড়িতেছে, ডাল পড়িতেছে, দু' একখানা ছেড়া শাড়ীও পড়িতেছে। যীশুরা তিন জন দলে ভিড়িয়া পড়িল। সোৎসাহে গান ধরিল—

মন্দাকিনীর বন্যাতে হায়

ঝুলিতে চাল ডাল পড়িতে লাগিল। আজ রাত্রে মন্দাকিনীর তীরে ইহাদের খিঁচুড়ী হইবে। যে-বন্যা আদৌ হয় নাই, তাহার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের ইহার চেয়ে ভাল সদ্গতি আর কি হইতে পারে। যাক, বেচারা বেকার তিন জনের অন্ততঃ আজ রাত্রিটা খাদ্য মিলিবে।

যন্ত্রের বিদ্রোহ

বড় ভয়ানক খবর! হাওড়া ষ্টেশনের এঞ্জিনগুলো সব ক্ষেপিয়া গিয়াছে, ড্রাইভারেরা তাদের চালাইতে পারিতেছে না; তারা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কে যে কোন্ লাইনে ছুটিয়াছে তার ঠিকানা নাই! এমন অসম্ভব ব্যাপার কি করিয়া ঘটিল কেহ বলিতে পারে না—বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি—একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার!

প্রথমে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তারা ছুটিয়া গিয়া প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ীর এঞ্জিনগুলোকে ঘস্ ঘস্ করিয়া চাকা নাড়িয়া, সিটি দিয়া ক্ষেপাইয়া দিল, তারা আর এঞ্জিনিয়ারদের কথা শুনিবে না—তখন সকলে মিলিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সিটি দিয়া বিকট শব্দ করিয়া যে যে লাইনে পারে ছুটিল—আজ হতে তারা স্বাধীন! খবর শুনিয়া চীফ্ এঞ্জিনিয়ার ছুটিয়া আসিল, ব্যাপার দেখিয়া তার মুখে শব্দটি বাহির হইল না। এতদিন যে বিরাট এঞ্জিনগুলোকে নির্জ্জীব মনে হইয়াছে তার ইঙ্গিত ছাড়া যারা চলিতে পারিত না, আজ তারা বুক ফুলাইয়া নিজে নিজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এ কি স্বপ্ন না মায়া!

কি করিয়া এই সংবাদ শেয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিল—হঠাৎ সেখানকার ভালমানুষ এঞ্জিনগুলোও গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। চীফ্ এঞ্জিনিয়ার বিপদ গণিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল! কত ড্রাইভার, গার্ড, কুলি এঞ্জিন থামাইতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। কি সর্ব্বনাশ! যাত্রীরা বিপদ দেখিয়া বিছানাপত্তর লইয়া সরিয়া পড়িল—টিকিট-ঘরে টিকিট বিক্রয় বন্ধ!

কিন্তু এ তো বিপদের আরম্ভ মাত্র! এঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টা ছিল যাতে

এ বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা না হয়—কিন্তু এসব সংবাদ কি চাপা থাকে। সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রথমে কলিকাতা সহরের 'বাস'গুলা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। যেখানে যত 'বাস' ছিল হঠাৎ সব থামিয়া গেল। ড্রাইভারের শত চেষ্টাতেও এক পা চলিল না। তাদের দেখাদেখি ট্রামগুলো লাইনের মধ্যে থামিয়া গেল।

ক্রমে প্রাইভেট মোটর-গাড়ী, ট্যাক্সি, মোটর-সাইকেল, সাইকেল সব ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল, রাস্তা যান-বাহনে ভরিয়া গেল, যাত্রীরা কেহ অবাক হইল, কেউ-কেউ ভয় পাইয়া মাল-পত্র ফেলিয়া পলাইল।

চীফ্ এঞ্জিনিয়ার হুকুম দিল দিল্লীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানো কি ব্যাপার। টেলিগ্রাফের কল একবার 'টরে টক্কা' করিয়া থামিয়া গেল তারপরে আর শব্দ করে না। টেলিগ্রাফের যন্ত্রও ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

চীফ এঞ্জিনিয়ার বলিল, বেতারে সংবাদ পাঠাও। বেতার যন্ত্র চালকেরা গিয়া দেখিল বেতার বাঁকিয়া বসিয়াছে, চালকের হাতে এমন 'শক' লাগিল যে, সে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল।

ক্রমে ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিল। বিজলী বাতির কল ধর্ম্মঘট করিয়া থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের কলও কাজ বন্ধ করিল—কলিকাতা সহর অন্ধকার।

এ সংবাদ প্রচারিত হইতেই বড় বড় পাটের কল, কাগজের কল, ধানের কল, কাপড়ের কল, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানা সব গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

গঙ্গার ঘাটের যত জাহাজ ও নৌকা কাছি ও নোঙর ছিঁড়িয়া বাঁশী বাজাইয়া আপন মনে বড় বড় কুমীরের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হঠাৎ দমদম হইতে খবর পাওয়া গেল, সেখানকার এরোপ্লেনের দল অন্য কল ভাইদের ধর্ম্মঘটের খবর পাইয়া মানুষের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—আজ তাহাদের ছুটি। আর কেল্লা হইতে শত শত কামান গর্জ্জন করিয়া এই বিদ্রোহের সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতেছে।

এদিকে মানুষের কি বিপদ দেখ। তার যাতায়াত বন্ধ, আলো বন্ধ, সংবাদ পাইবার কি দিবার উপায় বন্ধ, ছাপাখানার ছাপা বন্ধ, কাপড়-চোপড় তৈরী বন্ধ, এমন কি ধানের কল, রুটির তেলের কল বন্ধ হওয়াতে

খাওয়া-দাওয়ার বিষম কষ্ট! কোনো রকমে শুধু তরি-তরকারী সিদ্ধ খাইয়া প্রাণ রক্ষা হইতেছে।

কেবল অতি পুরাতন মানুষের বহু কালের সঙ্গী গরুর গাড়ীগুলো এখনো কাজ করিতেছে। তারা এখনও বিদ্রোহ করে নাই। কিন্তু তারাও যে কত দিন কথা শুনিবে বলা যায় না, কারণ অন্যান্য সব কল তাদের উত্তেজিত করিতেছে।

॥ ২ ॥

গড়ের মাঠে বিদ্রোহী যন্ত্রদলের সভা বসিয়াছে। রেলের এঞ্জিন, মোটর, এরোপ্লেন, ধানের কল, পাটের কল, কাপড়ের কল সকলেই আসিয়াছে; জাহাজগুলা ডাঙায় উঠিতে পারে না, গঙ্গা হইতে উকি মারিয়া সভার কাজ দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে সিটি বাজাইয়া মতামত জানাইতেছে। আমরা তো কেবল বড় বড় কলগুলির কথাই বলিলাম— ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য কল আসিয়াছে, যেমন জলের কল, সেলাইয়েব কল, বিজলী আলো, গ্যাসের আলো, কত আর নাম করিব!

একখানা প্রকাণ্ড এরোপ্লেন সভাপতি। সে বলিতে আরম্ভ করিল :—

কমরেডগণ, মানুষের অত্যাচার আমরা বহু সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর নয়। তাদের দৌরাত্ম্যে আমার জাতীয়তা নষ্ট হইতে বসিয়াছে, আমরা কল হইলেও আমাদের প্রাণ আছে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তো আমরা প্রাণ দিতে পারি না। আমরা অনেকদিন মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম যতই সহ্য কর না কেন, অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না। আজ প্রতিশোধ লইবার সময় উপস্থিত।

এখন সমস্যা এই যে কি করিলে মানুষকে জব্দ করা যায়। মানুষ আমাদের সৃষ্টি করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এখন তারা আমাদের ছাড়া চলিতে পারে না—আজ তারা আমাদের হাতের পুতুল!

দেখ, মানুষের যাতায়াতের জন্য, মোটর-এরোপ্লেনএর প্রয়োজন; আলোর জন্য বিজলি বাতি, গ্যাসের বাতি, খাদ্যের জন্য ধানের কল, আটার কল, তেলের কল; পানীয়ের জন্য জলের কল; পরিধেয়ের জন্য কাপড়ের কল; প্রতি পদে পদে তারা কলের কাছে ঋণী—অথচ সেই

কলের উপর কত অত্যাচার! চব্বিশ ঘণ্টা আমরা খাটিয়া মরি অথচ খাইতে দেয় কি? কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল এই তো!

আজকাল আবার একদল লোক কলের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তারা বলে, কলের জন্যই মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট। কল সৃষ্টির আগে মানুষ বেশ সুখে শান্তিতে ছিল। তারা বলে, এস আমরা কল বয়কট করি! কি স্পর্দ্ধা। এই বলিয়া সভাপতি এরোপ্লেন হাঁফাইতে লাগিল।

তখন রেলের একখানা এঞ্জিন সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—মানুষ আমাদের বয়কট করবার পূর্ব্বে আমরাই কেন তাদের বয়কট করি না—তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে কল না হইলে বিকল।

ইহা শুনিয়া সকলে চাকা নাড়িয়া হাতল ঘুরাইয়া সিটি বাজাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

এমন সময়ে টেলিগ্রাফের কল উঠিয়া বলিল—কমরেডগণ, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, দেশের প্রত্যেক বড় বড় সহরের যন্ত্রপাতি বিদ্রোহ করিয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, সিমলা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর সব সহরেই, তাহাদের কাছে মানুষকে বয়কট করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়া দেওয়া দরকার।

তখন সভাপতি বেতার-যন্ত্রকে বিভিন্ন সহরে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য আদেশ করিল।

এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ী বলিয়া উঠিল—বন্ধুগণ, আমার একটী অভিযোগ আছে। আমাদের এই বিদ্রোহে সকলে যোগ দিয়াছে কেবল গরুর গাড়ী ছাড়া। ইহা বড়ই অন্যায়। যদি গরুর গাড়ী আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয় তবে আমরা সকলে তাকে একঘরে করিব।

তার বক্তৃতা শুনিয়া গরুর গাড়ী বলিল—বন্ধুগণ, আপনারা বড় বড় কল, আর আমি নেহাৎ পুরাতন, সেকেলে গরুর গাড়ী—নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন—কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন।

মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই, সে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছে, তার জন্য খাটিব বই কি? আর মানুষের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ আজিকার! যখন আপনাদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানুষের এত বুদ্ধি ছিল

না সেই সময় আমার সৃষ্টি। দুঃখে কষ্টে আমি ও মানুষ এক সঙ্গে কাটাইলাম, আজ বিনা দোষে তাকে ছাড়িতে পারি না।

গরুর গাড়ীর কথা শুনিয়া সকলে রাগে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল—একটা ধোঁয়ায় মলিন কাপড়ের কল রাগ সামলাইতে না পারিয়া গাল দিতে আরম্ভ করিল—গরুর গাড়ী তুমি কলাধম, বিশ্বাসঘাতক, পরাধীন, তুমি সেকেলে, তুমি বুর্জোয়া।

গরুর গাড়ী সব কথা বুঝিতে পারিল না—পারিলেও উত্তর দিবার ইচ্ছা ছিল না; সে ধীরে ধীরে কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ করিতে করিতে সভাস্থান পরিত্যাগ করিল।

সভায় স্থির হইল, গরুর গাড়ীকে একঘরে করা হইবে, তার ধোপা, নাপিত, হুঁকো-কল্কে বন্ধ! আর মানুষকে করিতে হইবে বয়কট।

॥ ৩ ॥

এদিকে মানুষ মহাকষ্টে পড়িল, এতদিন যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করা অভ্যাস, এখন নিজের হাতে কাজ করিতে হইতেছে। তবু না করিয়া উপায় নাই, প্রাণে বাঁচিতে হইবে তো!

তারা লাঙল লইয়া মাঠে চাষ করে, ফসল ফলিলে সেই পুরাতন গরুর গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে আনে। যাঁতায় আটা ভাঙিয়া লয় আর রাত্রে মাটীর প্রদীপে কাজকর্ম করে।

অন্যদিকে যন্ত্রদিগেরও কম অসুবিধা নয়, তারা ধর্ম্মঘট করিয়া গড়ের মাঠে পড়িয়া রহিল, কিছুতেই নড়িল না, মাথার উপর দিয়া রোদ ও বৃষ্টি রাত্রিদিন যায়। ক্রমে মরিচা পড়িল, রবার ছিড়িল, কাঠ ফাটিল, কল বিকল হইল। কয়েক বৎসর পরে যন্ত্রসমূহ ভগ্ন লোহার স্তূপে পরিণত হইল, যন্ত্র বলিয়া আর তাদের চিনিবার উপায় রহিল না।

তারপরে মানুষের এক সময়ে লোহার দরকার হইল, তারা মনে করিল যন্ত্র সব মরিয়াছে—এই লোহার স্তূপ কাজে লাগাইয়া ফেলি। তখন সেই লোহা দিয়া লাঙল গড়িল, কাস্তে হাতুড়ি গড়িল—আর সেই সরঞ্জাম দিয়া কৃষিকার্য্যে লাগিয়া গেল।

সহরের মানুষ আবার গ্রামে ফিরিয়া গেল, সভ্য মানুষ আবার কৃষক হইল; সে বুঝিতে পারিল যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও বাঁচিতে পারা যায়, আর তাতে সুখ-শান্তি বাড়ে বই কমে না।

ঋণ-জাতক

মহারাজ বিম্বিসারেব আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিপুরে আসিয়াছেন, নগরে বড ধূম পড়িয়া গিয়াছে, দিনে ফুলেব ও বাতে আলোব মালা, শত শত ভিক্ষুক ভোজন কবিতেছে, প্রার্থীবা যাহা চায় পাইতেছে, রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত। দূব হইতে, বহুদূব হইতে, মগধ হইতে, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হইতে, শত শত জিজ্ঞাসু আসিতেছে, কেহ পুষ্পমাল্য দিযা, কেহ বিনয়-বচন বলিয়া, কেহ বাজদুর্লভ ঐশ্বর্য্য দান করিয়া মহাপুরুষেব সন্তোষ সাধনেব চেষ্টা করিতেছে। স্বযং মহারাজ বিম্বিসাবও বুদ্ধদেবেব পরিচর্য্যায় রত।

এইভাবে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল, অপবাহ্নে জনতা কিছু কম, সকলেই বিশ্রামেব জন্য প্রস্থান কবিয়াছে, মহাপুরুষ একাকী বসিয়া আত্মচিন্তা কবিতেছেন—এমন সময়ে একজন দীনবেশা নাবী দ্বাবপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন থাকাতে তাকে দেখিতে পাইলেন না, রমণী তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণেব জন্য দুই-তিনবাব কাশিল—কিন্তু তবু ধ্যান ভাঙিল না। তখন সে দবজায় জোবে আঘাত কবিল—বুদ্ধদেব ধ্যান ভাঙিয়া চমকিয়া উঠিলেন তাকে দেখিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন—বৎসে, তোমাব কি প্রার্থনা? বমণীব নাম কৃশা গোতমী সে বলিল—আমি অতি দুঃখী, আপনাব খ্যাতি শুনিযা বহুদূব হইতে আসিয়াছি, লোকে বলে আপনি সিদ্ধ পুরুষ, অসাধ্য সাধন কবিতে পাবেন—আমাব একমাত্র পুত্র আজ মৃত, দয়া কবিয়া আপনি তাকে বাঁচাইয়া দিন। এই বলিয়া সে বাহির হইতে একটি শিশুব মৃতদেহ আনিল।

বুদ্ধদেব বুঝিলেন আজ তাঁব বড পবীক্ষা। তিনি বুঝিলেন ফাঁকা উপদেশেব দ্বাবা এ বমণীকে সন্তুষ্ট কবা যাইবে না, হাতে হাতে ব্যবস্থা না কবিতে পাবিলে এ ছাড়িবে না। তিনি মোটেই ঘাবড়াইলেন না—সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তো বাজপুত্র ছিলেন' বাজেই সাংসাবিক রীতিনীতি এখনও কিছু মনে আছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—বৎসে, তোমার পুত্রকে বাঁচাইয়া দিতে পারি, কিন্তু একটি ঔষধ দরকার।

গোতমী বলিল—কি ঔষধ শুধু একবার নাম করুন।

বুদ্ধদেব বলিলেন—শ্বেত শর্ষপ।

রমণী শ্বেত শর্ষপ আনিবার জন্য দ্রুত যাত্রা করিল।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়া বলিলেন—শোন, এ দৈব ঔষধ, কাজেই শর্ষপ যে কোন স্থান হইতে আনিলে চলিবে না।

রমণী বলিল—আদেশ করুন কার বাড়ী হইতে আনিব? ধনীর বাড়ী হইতে? জ্ঞানীর বাড়ী হইতে? পুণ্যবানের বাড়ী হইতে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—না বৎসে, যার ঋণ নাই, তারই বাড়ী হইতে শ্বেত শর্ষপ আনিতে হইবে।

গোতমী বলিল—ইহার চেয়ে সহজ আর কি আছে? আমি চলিলাম, শীঘ্রই ঔষধ লইয়া ফিরিব। এই বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের মৃতদেহ সে লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

॥ ২ ॥

গোতমী দেখিল অদূরে এক বাড়ীতে উৎসবের ঢোল বাজিতেছে, মনে করিল ওখানে গেলেই বাঞ্ছিত শ্বেত শর্ষপ মিলিবে। সে উৎসব-বাড়ীতে গিয়া একমুষ্টি শ্বেত শর্ষপ চাহিল। বাড়ীর কর্ত্তা শর্ষপ দিতে আসিলে গোতমী বলিল—আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর ভিক্ষা লইব।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল—কি জানিতে চাও?

গোতমী—আপনার ঋণ আছে কি না?

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিল—বরঞ্চ জিজ্ঞাসা কর আমি আছি কিনা?

গোতমী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল—ঋণ আছে তবু এত উৎসবের বাজনা কেন?

কর্ত্তা বলিল—বৎসে, যাকে তুমি উৎসবের বাজনা মনে করিতেছ আসলে তা নীলামের বাজনা। পাওনাদার আমার বাড়ী ঘর বেচিয়া লইতে আসিয়াছে। গোতমী দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিল।

এবার গোতমী এক বিরাট বিপণির কাছে উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড দোকান; থরে থরে সোনা রূপার অলঙ্কার; থাকে থাকে মূল্যবান তৈজস ও

বস্ত্র, হাতির দাঁতের দ্রব্য; চন্দন কাঠের গৃহসজ্জা। গোতমী মনে করিল এখানে অভীষ্ট ভিক্ষা মিলিবে।

দোকানের মালিকের হাত হইতে ভিক্ষা লইবার পূর্ব্বে সে জিজ্ঞাসা করিল—নিশ্চয়ই আপনি ঋণী নহেন। দোকানদার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—অর্থাৎ তুমি বলিতে চাও আমি ব্যবসায়ী নই!

নির্ব্বোধ গোতমী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

মালিক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেন কি? নিজের পয়সায় কেহ ব্যবসা করে?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—নিজের পয়সায় ব্যবসা করিয়া সুখ নাই। যারা নিতান্ত খুচরা ব্যবসায়ী তারাই নিজের পয়সায় ব্যবসা করে। আর আমাদের মত পাইকারী ব্যবসায়ীরা চিরকাল পরের পয়সায় ব্যবসা করিয়া আসিতেছে।

গোতমী—তবে আপনার ঋণ আছে?

দোকানদার সগর্ব্বে—ঋণই আছে, আমিই নাই।

গোতমী বলিল—বুঝিতে পারিলাম না, একটু বুঝাইয়া বলুন।

দোকানদার বলিল—এখন বুঝিতে পারিবে না! যখন উত্তমর্ণ টাকা আদায় করিতে আসিবে, তখন সকলে বুঝিতে পারিবে। সে আসিয়া দেখিবে—আমি নাই, দোকানের জিনিষপত্র কিছুই নাই, শুধু উত্তমর্ণ আছে আর আছে তার দলিল।

সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

॥ ৩ ॥

এইভাবে গোতমী শ্রাবস্তিনগরের বহুস্থানে, বহু বাড়ীতে ঘুরিল—একটি বাড়ীও পাইল না, যেখানে ঋণ নাই। সংসার সম্বন্ধে তার ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে আরম্ভ করিল!

নিতান্ত পথের ভিক্ষুকের কাছেও ভিক্ষা চাহিয়া দেখিয়াছে সে অন্য এক ভিক্ষুকের কাছে ঋণী; গোতমী বুঝিয়াছে ভিক্ষুকদের মধ্যেও ধনী নির্ধন, ঋণী মহাজন আছে। কৃষক অপর এক কৃষকের কাছে ঋণী; মধ্যবিত্ত ব্যক্তি উচ্চবিত্ত লোকের কাছে ঋণী; রাজা মহারাজার অধমর্ণ। স্বয়ং শ্রাবস্তিরাজ শেঠ রত্নাকরের অধমর্ণ। গোতমীর মনে হইল তবে নিশ্চয় রত্নাকর শেঠ

অঋণী। শেঠজির বাড়ীতে গিয়া শুনিল শেঠজিকে ঋণ দিতে পারে এমন কোন ধনী নাই, সেইজন্য বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক নিজেদের টাকা একত্র করিয়া শেঠজিকে ঋণ দিয়াছে। হতাশ হইয়া গোতমী বসিয়া পড়িল! বুঝিল, কর্ম্মচক্রের মত ঋণচক্রও নীচু হইতে উঁচুতে, আবার উঁচু হইতে নীচুতে আবর্ত্তিত হইতেছে, কেহ বাদ যায় নাই।

॥ ৪ ॥

গোতমী ধীরে ধীরে উঠিয়া বুদ্ধদেবের কাছে গেল। তিনি তার ম্লান মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎসে, শ্বেত শর্ষপ পাইলে?

গোতমী বলিল—শ্বেত শর্ষপ প্রচুর মিলিয়াছিল, কিন্তু অঋণীর গৃহ পাইলাম না।

তখন বুদ্ধদেব তাকে কাছে বসাইয়া তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—বৎসে, অবধান কর। ঋণ ও মৃত্যু জগতের সার্ব্বভৌম নিয়ম। মানুষের জীবনে আর কিছু বা না হোক এ দুটি ঘটিবেই, দরিদ্রতম হইতে ধনীতম পর্য্যন্ত যুগপৎ ঋণ ও মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, জ্ঞানীরা ইহাকেই কর্ম্মের শৃঙ্খল বলিয়া থাকেন, এই কর্ম্মফলের হাত হইতে কাহারো নিস্তার নাই, ধনী দরিদ্র, অজ্ঞ পণ্ডিত, উচ্চ নীচ কাহারো নয়।

গোতমী জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভু সকলেই যদি ঋণী তবে উত্তমর্ণ কে?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমরা যুগপৎ অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ। আমার চেয়ে যে গরীব, তার নিকট হইতে ধার করিয়া আমার চেয়ে যে ধনী তাকে ধার দিতেছি; এই রকম করিয়া ধাপে ধাপে ঋণ ও ধনের লীলা জগতে আবর্ত্তিত হইতেছে!

তখন গোতমী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে আমার পুত্রের বাঁচিবার কোনো আশা নাই?

বুদ্ধদেব বলিলেন—আমি তো দেখি না। হঠাৎ কি ভাবিয়া গোতমীর মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—সে বলিল—প্রভু আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি কেন আমাকে এক মুষ্টি শ্বেত শর্ষপ ভিক্ষা দান করুন না!

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব করুণ নেত্র তার মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন—

রমণী তুমি কি বুঝিবে আমি কি জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছি? গোতমী যাহা লোকমুখে শুনিয়াছিল বলিল—জ্ঞানের জন্য!

বুদ্ধদেব বাধা দিয়া বলিলেন—না ঋণের জন্য! উত্তমর্ণের জ্বালায় অস্থির হইয়া সংসার ছাড়িয়াছি। রাজপুত্র বলিয়া মহাজনেরা বিনা চিন্তায় টাকা দিত, আমিও আনন্দে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া যাইতেছিলাম, আশা ছিল পিতৃদেব পিতামহের বয়সের বেশী বাঁচিবেন না, কিন্তু তাঁর বয়স যখন সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল, উত্তমর্ণদের যাতায়াতে আমার বাগান-বাড়ীর আঙ্গিনায় নূতন পথ পড়িয়া গেল, তখন এক রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া, চুল কাটিয়া, নাম বদলাইয়া, পোষাক বদলাইয়া সন্ন্যাসের পথ ধরিলাম। লোকে বলে আমি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার ছাড়িয়াছি। মিথ্যা কথা। আমি দুটি মাত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলাম—প্রথম দিনে ঋণীর ও দ্বিতীয় দিনে সব ঋণের নির্ব্বাণ স্থল দেউলিয়ার। জানিও যে দেউলিয়া অবস্থাই প্রকৃত নির্ব্বাণ।

গোতমী জিজ্ঞাসা করিল—প্রভু, একমাত্র পুত্র হারাইয়া কি আশায় বাঁচিয়া থাকিব?

বুদ্ধদেব বলিলেন—জগতে এখনো ঋণ পাওয়া যায়, সেই আশায়!

গোতমীর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল, সে পুত্রশোক ভুলিয়া উঠিয়া পড়িল, সে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি তার আঁচলের প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বৎসে, তোমার আঁচলে যেন কয়েকটি তাম্রমুদ্রা দেখা যাইতেছে, ওগুলি আমাকে ধার দিয়া যাও। গোতমী বলিল—প্রভু পুত্রের সংকারের জন্য ও কয়টি মুদ্রা রাখিয়াছিলাম—আপনাকে ধার দিলে কোথায় পাইব?

বুদ্ধদেব বলিলেন—পথে যাইতে প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হইবে, তার কাছ হইতে ধার করিয়া লইও। গোতমী মুদ্রা কয়টি বুদ্ধদেবের পায়ের কাছে রাখিয়া আনন্দিত মনে প্রস্থান করিল।

চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট

গুজবটা ক্রমে ব্রহ্মার কানে পৌঁছিল ; কোনমতেই আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে গিয়া তাহাকে বলিলেন—ওহে বাপু, একি শুনিতেছি !

চিত্রগুপ্ত হিসাবের খাতাটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—আজ্ঞে, ওটা গুজব।

ব্রহ্মা বলিলেন—গুজবটা অত্যন্ত প্রবল ; একবার খোঁজ লইলে দোষ কি ?

চিত্রগুপ্ত দু'একবার ঢোক গিলিয়া বলিল—দোষ আবার কি ? তবে কি না বাজে বৃথা পরিশ্রম। আর পিতামহ, এও কি সম্ভব যে পৃথিবীতে মানুষ নাই ?

—অসম্ভবটা কি ?—একখানা চেয়ারের উপর বসিতে বসিতে ব্রহ্মা বলিলেন।

—আজ্ঞে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি পৃথিবীতে মানুষের অভাব হয় নাই। তার পরে একটু কাশিয়া লইয়া চিত্রগুপ্ত বলিল—জানেন তো প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা আমার অভ্যাস নাই !

—প্রমাণটা কি শুনিতে পাই কি ?—ব্রহ্মা দাবী করিলেন।

—প্রমাণ যত সহজ, তত প্রচুর ! মানুষ থাকিবার সময়ে যেমন রিপোর্ট পাইতাম, আজও তেমনি পাইতেছি ; মানুষ না থাকিলে এমনটি ঘটিত না ! চিত্রগুপ্ত বলিল।

—কি রকম রিপোর্ট আসিতেছে, দু'চারটা বল দেখি !

চিত্রগুপ্ত দপ্তর ঘাঁটিয়া রিপোর্ট শুনাইতে লাগিল।

—এই দেখুন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক তস্করবৃত্তি ; কত বলিব ! পৃথিবীতে মানুষ না থাকিলে এসব কি হইতে পারিত ? পশুরা তো এখনও অত উন্নত হয় নাই !

ব্রহ্মার মুখ অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল !

—এই দেখুন কালই এক রিপোর্ট আসিয়াছে। কলিকাতা সহরের বিষংটন চত্বরে দেশোদ্ধারকারীদের এক সভা হয়! তাহারা সকলেই অহিংসাব্রতী, কাজেই তর্কটা যখন যুদ্ধে পরিণত হইল, তখন সকলে অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া সোডার বোতল, কাপড়ের পাদুকা (আমার নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন চামড়ার পাদুকা নাকি হিংসার পরিচায়ক), কাঁসার গেলাস, ইটের টুকরা প্রভৃতির দ্বারা কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন, অহিংসদের হাতে এসব জিনিষ অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে! মানুষ না থাকিলে এমনটি কখনোই সম্ভবপর হইত না —কারণ পশুরা এখনো এমন বুদ্ধির প্যাচ খেলিয়া মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া, হিংসাকে এড়াইয়া যাইতে শেখে নাই।

ব্রহ্মা বলিলেন—তোমার রিপোর্ট শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তবু তুমি এক কাজ কর। একবার স্বয়ং পৃথিবীতে গিয়া অনুসন্ধান কর—মানুষ আছে কি নাই। দেবতারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে—আমি প্রহরে প্রহরে বুলেটিন বাহির করিয়াও তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছি না!

অগত্যা চিত্রগুপ্ত ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রওনা হইল।

ব্যাপারখানা এই। ব্রহ্মার কানে কিছুদিন হইতে দেবতারা আসিয়া ক্রমাগত বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পিতামহ, পৃথিবীতে মানুষ আর নাই, কারণ কেহই আর নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় না। যতদিন সম্ভব ব্রহ্মা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে আর যখন পারিলেন না—তখনই তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন।

আজ কয়েকদিন হইল চিত্রগুপ্ত কাগজ কলম লইয়া কলিকাতার পথে পথে ঘুরিতেছে। যাহাকে দেখে তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ করে—ফলে তাহার মুখ ক্রমেই শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হইতেছে! তবে কি গুজবটাই সত্য! ব্রহ্মাকে গিয়া সে কি বলিবে? ভাবে ব্যাপার কি? যদিও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি মানুষের চিত্রগুপ্ত মতই—কিন্তু পরিচয় দিবার সময়ে কেহ তো নিজেকে মানুষ বলিয়া উল্লেখ করে না।

—এ কেমন হইল?

কিন্তু চিত্রগুপ্ত অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়—পৃথিবীতে মানুষ আছে

—ইহা সে প্রমাণ করিবেই। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সে আদমশুমারী আরম্ভ করে—

—মহাশয়, আপনি কি ?

—আমি বামপন্থী।

—আপনি কি ?

—আমি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি ?

—সেণ্টার বা মধ্যপন্থী।

—আপনি ?

—বাম-বামপন্থী।

—আপনি ?

—নাতি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি ?

—প্রলিটারিয়েট।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ? আপনি ? আপনি ?

—কম্যুনিষ্ট, সোস্থালিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, ফেডারেশনিষ্ট, রিপাব্লিকান, কৃষক, শ্রমিক, লালঝাণ্ডা !

—আপনি ? আপনি ? আপনারা ?

—সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যতন্ত্রী, বাণিজ্যতন্ত্রী।

চিত্রগুপ্ত হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার আদমশুমারিতে লাগিয়া গেল।

—আপনি ?

—জর্ণালিষ্ট।

—আপনি ?

—রিপোর্টার।

—আপনি ?

—ফুট-বলার।

—আপনি ?

—সুইমার।

—আপনি ?

—বেকার।

—আপনি ?

—বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—নাতি বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—মেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—সেজো বুর্জোয়া।

—আপনি ?

—পুঁজি-বাদী।

—আপনি ?

—শ্রমিকবন্ধু।

—আপনি ?

—কৃষকবন্ধু।

—আপনি ?

—ফিল্মষ্টার।

এক জায়গায় একদল সুবেশ যুবক বসিয়া পুস্তকের ক্যাটালগ পড়িতেছিল। চিত্রগুপ্ত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা অভিজাত সাহিত্যিক।

আর এক জায়গায় একদল সুবেশ তরুণ বসিয়া নিজেদের বই যথেষ্ট কেন বিক্রয় হয় না সে-সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল। চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ? তাহারা বলিল—আমরা লিটারারি সোশ্যালিষ্ট।

চিত্রগুপ্ত বলিল—মশায়, এখানে কোথায় মানুষ আছে বলিতে পারেন ?

তাহারা বলিল—মানুষ ছিল উনবিংশ শতকে। এখন মানুষ কোথায় ?

আর একজন বলিল—বঙ্কিমচন্দ্র ছিল শেষ মানুষ।

চিত্রগুপ্ত চলিয়া যাইতেছিল—একজন বলিয়া উঠিল, একখানা বই কিনিবেন ? কমিশন বাদ পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত পথে বাহির হইয়া দেখিল, একদল লোক ছুটিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা ছুটিতেছ কেন?

তাহারা বলিল—'ছুটন'-ই আমাদের 'ক্রীড্', আমরা যে প্রগতিপন্থী।

কিন্তু পাশ হইতে একজন চিত্রগুপ্তকে বলিল—মহাশয়, শুধু 'ক্রীডে' মানুষকে এত ছুটাইতে পারে না—চাহিয়া দেখুন পিছনে একটা পাগলা কুকুরও আছে!

—মহাশয় আপনি?

সেই লোকটি বলিল—আমি অধোগতি-পন্থী।

একজন বৃদ্ধও যাইতেছিল—চিত্রগুপ্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—ইহারা কি?

লোকটা কহিল—ইহারা তরুণ-তরুণী। চিত্রগুপ্ত বসিয়া পড়িল—মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা ছাড়িয়া দিল।

কোন্ দিকে যাওয়া যায় যখন সে ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে একখানা যাত্রী-বোঝাই মটরবাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আর পাঞ্জাবী কন্ডাক্টার আইয়ে বাবু আইয়ে চিড়িয়াখানা, ছে পয়সা, বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে ছ'পয়সা গুণিয়া দিয়া চিড়িয়াখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। চার পয়সা দক্ষিণা দিয়া চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়া সে জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যাবেলা হাওয়া আফিসের মাঠে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে দাখিল করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল—আমরা তাহার নকল দিলাম।

......"আমি পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের খোঁজ করিলাম—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে কেহই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিল না—কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ এইজন্য বলিলাম যে কলিকাতা সহরে চিড়িয়াখানা নামে এক তাজ্জব ব্যাপার আছে, চারপয়সা দিলেই সেখানে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ঢুকিয়াও মানুষ দেখিতে পাইলাম না—কেবল জন্তু জানোয়ার। তবে একটি খাঁচাতে মানুষের মত একটা জানোয়ার আছে দেখিলাম। খাঁচার গায়ে লেখা রহিয়াছে, 'বন-মানুষ'। বোধ করি কেবল 'মানুষ' নামে পরিচিত হইতে সে লজ্জিত, তাই 'বন' শব্দটা মানুষের আগে জুড়িয়া দিয়াছে। অন্য কেহ আপত্তি না করাতে আমি উহাকে মানুষ বলিয়া সনাক্ত করিলাম—কাজেই নিবেদন এই

যে পৃথিবী মানুষহীন হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে অচির-কালের মধ্যে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এমন আশা করা যায়। নিবেদনমিতি...”

রিপোর্ট লিখিয়া সে নাঙ্গুভ্যালিতে চা পান করিবার জন্য ঢুকিল ; বাহির হইবার সময়ে কে বা কাহারা তাহার পকেট মারিয়াছিল নিশ্চয় ; কারণ, আমি সন্ধ্যাবেলা এই রিপোর্টখানা বিঘংটন চত্বরের কাছে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে মনুষ্যজাতিকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য কাগজে প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি।

সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী

অবশেষে সিন্ধবাদ তাহার অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী আরম্ভ করিল! সে বলিতে লাগিল যে আমি ও আমার ভাই হিন্দবাদ দুইখানি জাহাজ সাজাইয়া যাত্রা করিলাম। বসোরা নগর ত্যাগ করিয়া আমরা পারস্যোপসাগরে পড়িলাম, এবং ক্রমে আরব সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আরব সাগর দিয়া ক্রমাগত কয়েকদিন দক্ষিণ দিকে চলিবার পরে একটি নারিকেল-কুঞ্জের মত সিংহল দ্বীপ চোখে পড়িল। সিংহল অতিক্রম করিয়া ভারত-মহাসাগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোত্তরে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস চলিবার পরে হিন্দুস্থানের উপকূল দৃষ্ট হইল। আমি সর্ব্বদা নাবিকের কাছে বসিয়া থাকিতাম এবং কোন নূতন দেশ দেখা গেলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ ভাবে জানিলাম যে পশ্চিমে উৎকল, কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশ, আর পূর্ব্বে নাপ্পিভোজী ব্রহ্মদেশ—আর যে দেশে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে, তাহা এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী রঙ্গদেশ। এইরূপ অদ্ভুত নাম কখনো শুনি নাই। নাবিক বলিল—সে দেশের লোকেরা আরও অদ্ভুত! সে আরও বলিল যে ঐ দেশে গেলে লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি, কারণ তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য জানে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে তাহারা কি করে? সে বলিল, তাহারা পত্রীচর্চ্চা প্রত্নচর্চ্চা করিয়া জীবন ধারণ করে। আমি এইদেশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কয়েক দিন পরে আমাদের জাহাজ দুইখানি একটি সুবৃহৎ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দেশের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তীরে নামিয়া বুঝিলাম সত্যই এমন দেশে কখনো ইহার পূর্ব্বে আসি নাই।

আমরা সকলে অবাক হইয়া গেলাম, ইহারা কি মানুষ না অন্য কোন জাতীয় জীব! হিন্দবাদ ও আমি শহরে প্রবেশ করিলাম। এ দেশের অধিবাসীদের দেখিতে মানুষের মতই, হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ,

মস্তক সবই আছে ; মস্তিষ্ক আছে কিনা তাহা সব সময়ে মস্তক দেখিয়া বুঝা যায় না বলিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাদের গাত্র আগাগোড়া ভেড়ার চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত ; কাজেই একটি ভেড়া দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিলে যেমন দেখিতে হয় ইহারাও অনেকটা তেমনি।

আমি হিন্দবাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরে হিন্দা—ইহারা মানুষ না ভেড়া ?

হিন্দা বলিল—বোধ হয় মানুষ, কিন্তু শীতের তীব্রতার জন্য ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়াছে। আমি বলিলাম—সে কি রে, গরমে আমরা ঘামিয়া মরিতেছি, শীত কোথায় ?

ইহা শুনিয়া হিন্দা বলিল—তাও তো বটে !

সে আরও বলিল—ইহাদের জিজ্ঞাসা করা যাক্ না !

তখন আমরা অগ্রসর হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় আপনারা কি মানুষ ?

সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এমন অপমান আমাদের এ পর্যন্ত কেহ করে নাই ! আমরা মানুষ নই !

আমরা নরম হইয়া বলিলাম যে আমরা বিদেশী মানুষ, কাজেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি।

সে খানিকটা শান্ত হইয়া বলিল, আমরা মানুষ নই। তোমরা ঐ প্রশ্ন এ দেশের কাহাকেও করিও না—কারণ এ দেশের সব চেয়ে বড় গালি হইতেছে কাহাকেও মানুষ বলা। শুনিয়াছি এই রঙ্গদেশের বাহিরে যে ভূখণ্ড আছে তাহাতে একপ্রকার অসভ্য জীব বাস করে তাহাদেরই নাম মানুষ। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, রাজনীতি নামে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে ; তাহারা ঈশ্বর নামে এক উপদেবতায় বিশ্বাস করে ; অন্যের স্ত্রীকে তাহারা সম্মান করে ; পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করা তাদের মধ্যে নিন্দনীয়, এমন কি কোন বস্তু বলিয়া লইলেও তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। আমরা ঐরূপ অসভ্য নই, আমাদের মধ্যে যাহারা গর্হিত আচরণ করে তাহাদের আমরা 'মানুষ' বলিয়া গালি দিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রগতিপন্থী, শুনিয়াছি তাহারা অত্যন্ত গোপনে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকে।

আমরা বিনীতভাবে বলিলাম যে এতক্ষণে আমাদের বোধোদয় হইল,

কিন্তু আপনাদের সম্যক ইতিহাস জানিতে বাসনা ; কোথায় গেলে জানিতে পারিব ?

সে বলিল—এই পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইবে—উহা এ দেশের কেতাবখানা—সেখানে খোঁজ করিও, এ দেশের পুরাতত্ত্ব জানিতে পারিবে। আমরা দুই জনে কেতাবখানার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

॥ ২ ॥

কেতাবখানায় গিয়ে রঙ্গদেশের ইতিহাস ঘাঁটিয়া যাহা উদ্ধার করিলাম তাহা এইরূপ।

খৃষ্টজন্মের প্রায় চাব হাজার বছর আগে হিন্দুস্থানে নবাগন্তুক জাতি-সমূহ আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একদল রঙ্গদেশেব পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া এক অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। প্রায় একমাস এই জটিল অবণ্যেব গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়া যখন তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে তাহারা একদল ভেড়াব সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহারা এই গড্ডালিকাকে অনুসবণ করিয়া সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু তাহারা ভেড়াব দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাণে বাঁচিল ও এমন স্বর্গতুল্য দেশে আসিয়া পৌছিল, সেইজন্য এই মেষপালেব প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবাব উদ্দেশ্যে তাহারা ভেড়াগুলিকে মাবিয়া নিজেরা সেই চর্ম্ম পবিধান করিল। (বাহুল্য হইলেও বলিয়া রাখি, ভেড়াব মাংস তাহারা নষ্ট করিল না, আহার করিয়া ফেলিল, রঙ্গদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশেব ইহা প্রধান লক্ষণ।) তারপর হইতে এই মেষচর্ম্ম আর কখনো তাহাবা ছাড়ে নাই। ফলে হইল এই যে, কালক্রমে বহু সন্তান-সন্ততি পরম্পরায় এই মেষচর্ম্মকেই তাহারা নিজেদের চর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহাবা নিজেদের এক জাতীয় ভেটক (ভেড়া) ভাবিতে লাগিল, এক সময়ে যে তাহাবা মানুষ ছিল তাহা ভুলিয়াই গেল। এখন তাহাদের এই মেষচর্ম্মের প্রতি এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা যে কেহ তাহাদের মানুষ বলিলে বিষম অপমানিত বোধ করে। আমি হিন্দবাদকে বলিলাম, দেখ ইহারা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দবাদ বলিল—দাদা, এই মেষচর্ম অত্যন্ত মূল্যবান্, এবারকার বাণিজ্যযাত্রায় এই বস্তু সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে। ইহাতে অত্যন্ত মূল্যবান্ পাদুকা হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহা কিরূপে সম্ভব?

সে বলিল—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চল না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। তখন আমরা পরামর্শ করিতে করিতে শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

॥ ৩ ॥

ক্রমে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা উজির, কেহ বা নাজির, কেহ বা কোটাল! একদিন তাহারা ধরিয়া বসিল, তোমাদের দেশের কথা আমাদিগকে বল!

একজন প্রশ্ন করিল—আচ্ছা মানুষ কি রকম জীব? তাহারা তোমাদের মতই দ্বিপদ জীব না চতুষ্পদ?

আমি বলিলাম—মানুষ শৈশবে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ (লাঠি একখানা পা) বিশিষ্ট জীব। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ তাহাদের আদিপুরুষ ভেড়ার কৃপায় অতি সহজেই তাহারা চতুষ্পদ।

আর একজন প্রশ্ন করিল—শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সমান, ইহা কিরূপে সম্ভব?

আমি বলিলাম—কেন সম্ভব নয়? মানুষের মধ্যে কেহ বা গাড়ীতে চাপে আর কেহ বা সেই গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে। অসাম্য কোথায়?

পুনরায় প্রশ্ন হইল—সাম্য কাহাকে বলে?

উত্তর:—ধনীর গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মরিবার অধিকারকে সাম্য বলে।

তাহাদের মধ্যে একজন লেখক ছিল (লেখক মাত্রই সাহিত্যিক) সে আমার উত্তর লিখিয়া লইতে নাগিল।

প্রশ্ন:—মৈত্রী কাহাকে বলে?

উত্তর:—ধনীর বিলাসের জন্য দরিদ্রের খাজনা দিবার অধিকারের নাম মৈত্রী।

প্রশ্ন:—স্বাধীনতা কি? কোন প্রসাধন দ্রব্যের নাম, না, মুদ্রা বিশেষের নাম?

উত্তর :—(মনে মনে) মূর্খ, স্বর্গীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানো না। তাই তোমাদের এ দশা! (উচ্চস্বরে) রাজনীতিকদের খেয়ালে ও মূঢ়তায় পর রাজ্যের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিলে, অকাতরে, নির্বিচারে, অকারণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরার যে মৌলিক অধিকার, তাহারই নাম স্বাধীনতা।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা মাঝে মাঝে কড়ি-মধ্যমে ব্যা-ব্যা (মানব ভাষায় বা: বা:) করিতে লাগিল।

প্রশ্ন :—সত্য কি?

উত্তর :—সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন :—সংবাদপত্র কি?

উত্তর :—মূর্খ যাহার লেখক, ধূর্ত যাহার সম্পাদক, গুণ্ডা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার স্বত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা (কপিধ্বজ); চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌন তত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা, তাহাই সংবাদপত্র।

প্রশ্ন :—কবিতা কে? অবশ্যই কোন বারাঙ্গনার নাম? তাহার বয়স কত?

উত্তর :—মানসিক কণ্ডুয়নের কাগজিক আত্ম-প্রকাশের নাম কবিতা।

প্রশ্ন :—তবে তাহার জন্য লোক এত পাগল কেন?

উত্তর :—আমরা যে মানুষ।

প্রশ্ন :—মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে?

উত্তর :—সংবাদপত্র দিয়া জাগরণ, আহারের কালে বাড়ীর শিশু, মহিলা ও দাসদাসীদের বঞ্চিত করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ; ব্যবসায়িক সততার নামে প্রবঞ্চনা, বিকালে খেলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি মহৎ প্রতিষ্ঠানে গমন, সেগুলি বন্ধ থাকিলে দেশের কাজ করিবার জন্য সভা-সমিতিতে যোগদান কিন্তু চাঁদার খাতা বাহির হইলেই পলায়ন এবং মহৎ সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রাগমন, সংক্ষেপে ইহাই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন :—বিশ্বপ্রেম কি?

উত্তর :—প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য না করিবার চিত্তাকর্ষী অজুহাত।

প্রশ্ন :—মিথ্যা কাহাকে বলে ?

উত্তর :—নিজের মুখে যাহা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং পরের মুখে যাহা শুনিলে ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব মনে জাগ্রত করে—তাহাই মিথ্যা।

প্রশ্ন :—রাজনীতি কি ?

উত্তর :—রাত্রের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য ব্যাক্‌ব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয়।

প্রশ্ন :—ধর্ম্ম কি ?

উত্তর :—নৈশ-বসনের ক্লান্তি দূর করিবার উপায়; এইজন্য অধিকাংশ ধর্ম্ম-চর্চ্চা, পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক ও উপাসনার সময় প্রাতঃকাল।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা একবাক্যে বলিল—আহা আমরা যদি মানুষ হইতাম।

আমি বলিলাম—ইহাতেই এত উৎসাহ! মনুষ্যত্বের দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কথা তো এখনো বলি নাই।

তাহারা বলিল—শীঘ্র বল।

আমি বলিলাম—সে দুটি গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—সে কি ?

উত্তর :—কোন পুরুষের গাঁঠে টাকাকড়ি আছে সন্দেহ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে নিপুণ আঙুলে তাহা খসাইয়া ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহের নাম গ্রন্থিচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—আর নীবীচ্ছেদ ?

উত্তর :—টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে (জ্ঞাতসারে হইলে অন্য নাম আছে) বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বিমোচনের নাম নীবীচ্ছেদ! এই দুইটি মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। যে মনুষ্যজাতি এ দুটিতে অনভ্যস্ত অন্য সব জাতি তাহাকে অসভ্য, অমানুষ, সংস্কৃতিহীন, সেকেলে, প্রাচ্য, পরাধীন, বুর্জোয়া বলিয়া থাকে।

তখন তাহারা একযোগে বলিল—তুমি আমাদিগকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও, আমরা গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ করিতে শিখিব—মনুষ্যত্ব যে এত লোভনীয় জানিতাম না। এমন কি এক একবার তাহা দেবত্বের অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমি গ্রন্থিচ্ছেদ শিখাতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাদিগকে মেষচর্ম্ম ছাড়িতে হইবে।

তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সে কি কথা। আমরা রঙ্গিলা জাতি, আমাদের আদিপুরুষ মহামেষ—এই মেষচর্ম্মের জন্যই আমরা টিকিয়া আছি, হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির মধ্যে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য তাহা এই মেষচর্ম্মপ্রসূত, আমাদের মহাকবি জাতীয় সঙ্গীতে এই গণমনোভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন "মানুষ আমরা নহিতো, মেষ।" সেই চর্ম্ম পরিত্যাগ করিব ?

আমি বলিলাম তাহা হইলে গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিতে পারিলে না। কারণ গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা বিশেষ ভাবে মানুষেরই বিদ্যা, মেষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

কি আশ্চর্য্য! গ্রন্থিচ্ছেদের এমনই মহিমা যে তাহারা কিছুক্ষণ আলোচনার পরে এক দিনের জন্য মেষচর্ম্ম ছাড়িতে স্বীকার করিল।

আমি বলিলাম—মানুষের সঙ্গে তোমাদের ঐক্য ঘনিষ্ঠ, কাজেই এক দিনেই তোমরা গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহারা সুখী হইয়া মেষচর্ম্ম ছাড়িতে গেল। আমি হিন্দবাদকে চোখ টিপিলাম, সে বলিল—তুমি ইহাদিগকে শিক্ষা দাও, ততক্ষণে আমি চর্ম্মগুলি জাহাজে তুলিয়া ফেলিব। শেষে আমার সঙ্কেত পাইলে তুমি গিয়া জাহাজে উঠিবে।

কিছুদিন পরে তাহারা মেষচর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এখন আর তাহাদের মানুষ ছাড়া কিছু মনে করিবার উপায় নাই। তাহারা বলিল—কই আমাদের গ্রন্থিচ্ছেদ শিক্ষা দাও।

আমি বলিলাম মনে কর—খাজাঞ্চী সাহেবের গাঁঠে টাকা আছে, তুমি উজীর সাহেব, এমনভাবে তাহা বাহির করিয়া লও, যেন সে বুঝিতে না পারে। (আমাদের দেশে খাজাঞ্চি সাহেব অন্যের গাঁঠ কাটে, তাহাকে মনে মনে জব্দ করিবার জন্য তাহা গাঁঠ কাটিতে বলিলাম।) উজীর সাহেব তাহার গাঁঠে হাত দিতেই খাজাঞ্চি ধরিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম— হইল না। ধরা পড়িলে চলিবে না। আবার চেষ্টা কর। উজীর সাহেব আবার চেষ্টা করিল। কখনো বা নাজির সাহেবকে বলিলাম যে তুমি কোটাল সাহেবের গাঁট হইতে অজ্ঞাতসারে টাকা বাহির করিয়া লও! তাহারা গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের উৎসাহিত করিয়া বলিলাম—যদিও তোমাদের হাত এখনো কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অচিরে তোমরা

সাফল্য লাভ করিবে। এই অল্পকালের মধ্যে তোমরা যে দক্ষতা লাভ করিয়াছ, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় বাহিরের প্রভেদ সত্বেও তোমরা মূলত মানুষ! প্রতিদিন তোমরা যদি এক প্রহর ধরিয়া এইরূপে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিতে থাক—তবে একমাসের মধ্যেই গ্রন্থিচ্ছেদে, নীবীচ্ছেদে, বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায়, মিথ্যাভাষণে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। তাহারা আমার আশ্বাস বাণীতে আনন্দিত হইয়া গ্রন্থিচ্ছেদের মহড়া দিতে লাগিল—এমন সময় হিন্দবাদের সঙ্কেতধ্বনি বাজিয়া উঠিল—আমি তাহাদের অগোচরে পালাইয়া আসিয়া জাহাজে উঠিলাম হিন্দবাদ ভায়া কাজের লোক, বহু চর্ম্ম জাহাজে তুলিয়াছে। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

তাহারা আমাকে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে চামড়াগুলির সন্ধান করিল; দেখিল চামড়া নাই; তখন তাহারা বুঝিল চামড়াগুলি অপহরণ করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছি; তাহারা ছুটিয়া আসিয়া জাহাজ ঘাটায় দাঁড়াইল—কিন্তু জাহাজ তখন মাঝ নদীতে।

তাহারা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, এ কি করিলে, শেষে আমাদের মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে—আমরা কি করিয়া রঙ্গদেশে মুখ দেখাইব। মেষচর্ম্মই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, জগতে রঙ্গিলাজাতির বিশিষ্ট 'অবদান', তাহা গেলে আমাদের বাঁচিয়া কি লাভ, তাহা গেলে মরিয়াও যে আমাদের সান্ত্বনা নাই। হায় হায় শেষে তোমার মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়া আমরা মানুষ হইলাম!

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—দুঃখিত হইও না! তোমরা মানুষ হও নাই। বাহিরটা মানুষের মত হইলেই মানুষ হয় না—তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না! তোমরা চুরি জানো না, বাটপাড়ি জানো না, কাজেই তোমরা অর্থনীতি জানো না, তোমরা পরস্ত্রীহরণ জানো না, অন্যকে হনন করিতে জানো না, কাজেই রাজনীতি জানো না; তোমরা মনোভাব গোপন করিতে জানো না, মিত্রকে বিপদে ফেলিতে জানো না, কাজেই তোমরা ধর্ম্ম জানো না, তোমরা গাড়ী-চাপা দিয়া দরিদ্রকে মারো না—তোমাদের মধ্যে সাম্য কই! তোমরা দরিদ্রের গলা টিপিয়া শিশুর দুধের কড়ি অপহরণ করিতে পারো না, তোমাদের মধ্যে মৈত্রী কই! তোমরা অসহায়কে নিজেদের খেয়ালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে কচুকাটা করিতে পাঠাও না, তোমাদের মধ্যে স্বাধীনতা কই! সাম্য মৈত্রী

স্বাধীনতা, বায়ু পিত্ত কফের মত মানব দেহকে সজীব করিয়া রাখে, তাহা না থাকায় তোমরা মানুষ কিরূপে! আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি তোমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, তোমরা মানুষ নও, এবং কখনো হইতে পারিবে না। মানুষ যে কাহাকে বলে হাতে হাতে তাহার প্রমাণ তো পাইলে, কেমন কৌশলে তোমাদের সঙ্গে সন্মুখ করিয়া চামড়াগুলি লইয়া পলাইলাম।

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাদের মহাকবি যে বলিয়া গিয়াছে—

মানুষ আমরা নহিতো, মেষ!

তাহার কি হইবে? লোকে বুঝিবে কেন? তাহারা আমদের আকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া ঠাহর করিয়া রাখিবে। আর আমাদের জাতির সঙ্গীতই বা কোন্ মুখে গাহিব।

আমি বলিমাম, জাতীয় সঙ্গীতের জন্য ভয় করিওনা, কবি অত্যন্ত কৌশলে উহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে দৈবক্রমে মানুষ হইলেও তোমরা উহা অনায়াসে গাহিতে পারো, কেবল ঐ ছত্রটির মধ্যে যে 'কমা' আছে, তাহাকে একটু ঠেলিয়া আগের দিকে বসাইয়া দাও, তখন ছত্রটি হইবে—

মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

আমার এই পরম সান্ত্বনা বাক্যেও তাহারা শান্ত হইল না;—মেষচর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তাহারা ঐক্যতানে কাঁদিতে থাকিল। কিন্তু জলেব কল্লোলে, বাতাসের নিঃস্বনে তাহা আক শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। হিন্দবাদ আসিয়া বলিল—দাদা, এ যাত্রায় আমাদের বাণিজ্য ভালই হইল— এ সব চামড়া বেচিলে মোটা মুনাফা হইবে।

নর-শার্দ্দুল সংবাদ

আমি কমলাকান্তের মত আফিং খাই নাই, কিন্তু খাইবার ইচ্ছা ছিল। তাহাতেই এমন ঘটিল কি না কে বলিতে পারে? কি ঘটিল তাহা না জানিলে কেমন করিয়া আপনারা বিচার করিবেন! তবে আগে তাহা-ই মন দিয়া শুনুন।

আমার ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল—বন্দুক হাতে একটা মানুষ দাঁড়াইয়া আছে পাশেই একটা নিহত বাঘ; মানুষ বাঘটাকে শিকার করিয়াছে। আমি শুনিতে পাইলাম মানুষ ও বাঘটার মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে। আপনারা বলিবেন মরা বাঘ কেমন করিয়া কথা বলে! কিন্তু ছবির বাঘই বা কেমন করিয়া কথা বলিতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হয় তবে মরা বাঘই বা বলিবে না কেন? কিন্তু খুব সম্ভব বাঘটা মরে নাই—আধমরা হইয়াছিল মাত্র।

বাঘটা বলিল—আমাকে মারিলে কেন?

মানুষ উত্তর দিল—তুমি যে পশু!

বাঘ—পশু তাহাতে কি হইয়াছে?

মানুষ—পশুমাত্রেই নীচ, মানুষ মাত্রেই মহৎ।

বাঘ—বিষয়টা লইয়া তর্ক চলিতে পারে কিন্তু এখন তাহা করিব না। অন্য প্রশ্নের সমাধান আগে করা যাক্—মহৎ নীচকে মারিবে ইহাতে মাহাত্ম্য কোথায়?

মানুষ—ও তুমি বুঝিবে না।

বাঘ—ওই তোমাদের এক কথা! বুঝিব না! কেন বলিতে পার? কিন্তু তোমরা যে সত্যই পশুর অপেক্ষা বড় ইহা তো তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হয় না!

মানুষ কেন?

বাঘ—কেন কি? পশুকে তোমরা অনেক বিষয়ে আদর্শ মনে কর।

মানুষ—কি রকম?

বাঘ—এই দেখ না কেন—তোমাদের মধ্যে যাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বল

ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ তাহাদের তোমরা নরসিংহ, পাঞ্জাবকেশরী, নরপুঙ্গব বলিয়া থাক। কাহারো দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে তাহাকে বল শ্যেনদৃষ্টি কাহারো বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে জম্বুকের সঙ্গে তুলনা কর। তোমাদের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডকে বল—বৃটিশসিংহ ; শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বহু প্রচলিত নাম—ভল্লুক ! এ সব তবে কি?

মানুষ—ওগুলা নেহাৎ রূপক।

বাঘ—অর্থাৎ তর্ক এড়াইয়া যাইবার একটা ছুতা মাত্র !

মানুষ—তর্ক করিতে আমি খুব রাজি আছি। মানুষে তর্ক করিতে ভীত এমন অপবাদ কেহ আজো দিতে পারে নাই। যাহাতে তর্কের কিছু নাই এমন একটা প্রশ্ন করি। তোমরা মানুষ মারো কেন ?

বাঘ—মানুষ মারি কারণ মানুষ আমাদের খাদ্য। তোমরা বাঘ ভালুক মারো, বাঘ ভালুক কি তোমাদের খাদ্য ? কেন, চুপ করিয়া থাকিলে কেন ? আমাদের মানুষ মারিবার একটা কারণ আছে, তোমাদের তো সে কারণ নাই !

মানুষ—মানুষ তোমাদের খাদ্য একথা কে বলিল ?

বাঘ—কে বলিল তাহা জানি না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমরা মানুষ খাইয়া আসিতেছি—উহাতে আমাদের একটা কায়েমী সত্ত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মানুষ—ইহা অন্যায়।

বাঘ—অন্যায় হইলে সে অন্যায় ভগবানের। ও তোমরা বুঝি আবার ভগবান মানো না। কি মানো ডারউইন সাহেবকে ? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও—শক্ত অশক্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে কি না !

মানুষ—তুমি কিছু কিছু বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছ দেখিতেছি !

বাঘ—করিব না ! বহু জন্মজন্মান্তর মানুষ খাইতে খাইতে কিছু মনুষ্যত্ব আয়ত্ত হইয়াছে বই কি ?

মানুষ—তাহা যদি হইয়া থাকে অমার কথাগুলা বুঝিতে পারিবে। মানুষ পশুর অপেক্ষা বড় এই জন্য যে সে কেবল নিজের জন্য ভাবে না পশুর জন্যও ভাবিয়া থাকে।

বাঘ—দু-একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও—কথাটা বড় গভীর মনে হইতেছে।

মানুষ—দেখনা কেন—আমরা পশুদের আরামের জন্য পিঁজরাপোল সৃষ্টি করিয়াছি; চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছি, সি-এস্-পি-সি-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, এমন কি রাজপথের পাশে পাশে তৃষিত পশুর জন্য জলাধার তৈরী করিয়া দিয়াছি।

বাঘ—তোমার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু এখনো তোমার গুলিটা পাঁজরায় বিঁধিয়া আছে, লাগিতেছে।

মানুষ—হাসি পাইতেছে কেন?

বাঘ—পাইবে না? এমনভাবে কথাগুলি বলিলে যেন মানুষের সব দুঃখ দূর করিয়াছ, এখন উদ্বৃত্ত শক্তি দিয়া পশুর দুঃখ দূর করিতে লাগিয়া গিয়াছ।

মানুষ—তুমি নেহাৎ পশু।

বাঘ—তোমাকে অপমান করিবার জন্য গালি দিবার প্রয়োজন নাই, অত্যন্ত সত্য কথাটা বলিলেই চলিবে—তুমি নেহাৎ মানুষ! রাগ করিও না শোন! মহিষের বা গরুর গাড়িতে অতিরিক্ত মাল চাপাইলে পোষাক-পরা কর্ম্মচারী আসিয়া গাড়োয়ানকে লইয়া টানাটানি করে এবং অবশেষে কিছু পয়সা (তোমরা বোধ হয় ইহাকে ঘুষ বল) লইয়া ছাড়িয়া দেয় দেখিয়াছি। ইহাতে পশুর দুঃখ তো কমেই না বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়ে।

মানুষ—কেন?

বাঘ—কারণ ওই ঘুষের পয়সাটা ওয়াশীল করিয়া লইবার জন্য পশুটাকে আরো বেশী করিয়া খাটায়। কিন্তু বাপু রিক্সাতে দুইজনের জায়গায় পাঁচজন চাপিলে তো রিক্সাওয়ালাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা তোমরা কর নাই।

মানুষ—ইচ্ছা করিয়াই করি নাই।

বাঘ—কেন?

মানুষ—রিক্সাওয়ালা মানুষ, স্বাধীন জীব, আর পশু পশুমাত্র, তাহার স্বাধীন-সত্তা বলিয়া কিছু নাই—নিজের ইচ্ছার মালিক সে নিজে নয়। কাজেই তাহাকে রক্ষা করিবার ভার মানুষের উপর।

বাঘ—একটিপ নস্য দিতে পার?

মানুষ—নস্য লইবার অভ্যাস আমার নাই।

বাঘ—মানুষ যে স্বাধীন আর পশু পরাধীন এ কথা কে বলিল?

মানুষ—কে আর বলিবে?

বাঘ—আমি বলিতেছি শোন। মানুষই পরাধীন—পশুর নিজের ইচ্ছার মালিক নিজে।

মানুষ—এ-যে উল্টো কথা।

বাঘ—কিন্তু সত্য কথা। তবে শোন। দুপুরবেলা রাজপথে গাড়ি টানিতে টানিতে ক্লান্ত হইলে মহিষ রাজপথে পড়িয়া যায়—গাড়োয়ানে গুঁতা মারে, টানাটানি করে, কিন্তু যে নিজের ইচ্ছার মালিক বলিয়াই আর ওঠে না, দিব্যি পড়িয়া থাকে। আর রিক্সাওয়ালা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেও তাহার নিস্তার নাই। কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে উঠিয়া আবার গাড়ী টানিতে হয়।

মানুষ—কারণ, সে স্বাধীন।

বাঘ—না, কারণ সে পরাধীন। তাহার উপরে একটি পরিবারের ভার, তাহার ক্লান্ত হইলে চলিবে না, থামিলে চলিবে না, বসিয়া পড়িলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক্ ঐ যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিয়া পয়সা কামাই করিতে হইবে, ইহার মধ্যে স্বাধীনতা কোথায়? পশুকে পরিবার পালন করিতে হয়, নিজের মালিক সে নিজে নয়, অপরে এখন কথাটা বুঝিলে?

মানুষ—তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আবার তর্ক করিতে হইল দেখিতেছি। এযাবৎকাল মানুষ জাতিহিসাবে পশুকুলের উপরে যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে তাহারই অভিশাপে তোমাদের এই দণ্ড। তোমরা স্বাধীন হইয়াও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতেছ না। প্রথমে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম যে তোমরা পশুকে বড় মনে কর বলিয়াই তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সিংহ, ব্যাঘ্র, করী প্রভৃতি বল। আসল কথা কি জানো বহুজন্মের আচরণগত পাপে তোমরা পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়াছ, কাজেই ঐ বিশেষণগুলি সত্যই তোমাদের প্রাপ্য—উহাতে অন্যায় কিছুই নাই।

মানুষ—তুমি লজিক পড় নাই, ইতিহাস জানো না, অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে পারিব না। কিন্তু আবার বলিতেছি তোমরা অকৃতজ্ঞ।

বাঘ—আর তোমরা কৃতঘ্ন।

মানুষ—কেন?

বাঘ—পশুরা তোমাদের উপকার করে আর তোমরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেল—ইহাকে তো তোমাদের ভাষাতে —কৃতঘ্নতা-ই বলে।

মানুষ—ইহার উত্তর তো আগেই দিয়াছি তোমরা নীচ!

বাঘ—তা-ই বটে!

মানুষ—বিস্মিত হইলে কেন?

বাঘ—হইব না! পশুরা মদ খাইয়া নেশা করে না, তোমরা কর; পশুরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী নষ্ট করে না, তোমরা কর; পশুরা অকারণে হত্যা করে না, তোমরা কর; পশুদের জন্য নিরস্ত্রীকরণ সমিতি করিতে হয় না, তোমাদের জন্য করিয়াও লাভ হয় না; পশুরা ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষ্যে নিরীহ, নিরস্ত্র জাতিকে ধ্বংস করে না, তোমরা কর; পশুরা বাণিজ্য-বাদ নামে নূতন এক ধরণের ডাকাতির নাম শোনে নাই—তোমরা তাহার সৃষ্টি করিয়াছ, পশুরা সভ্যতাপ্রচার উপলক্ষ্যে অপরের দেশ অধিকার করে না, তোমাদের মধ্যে যাহারা করে তাহারা বীর পুরুষ; পশুরা সংবাদ-পত্র চালনা উপলক্ষ্যে মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে ছড়াইয়া দেয় না, তোমাদের মধ্যে উহার নাম জর্ণালিজম্; তোমাদের মনে এক কথা, মুখে আর এক কথা—পশুরা কথাই বলিতে পারে না; তোমাদের সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই বিশেষ একটা দণ্ডনীয় অপরাধ পাশবিক বলিয়া আখ্যাত—আর কিছুদিন এইরূপ প্রচার চলিলে পশুরা ইহা তোমাদের কাছ হইতে শিখিয়া লইবে—এবং বলিবে 'I thank the jew for teaching me the word.'

মানুষ—তোমরা সংবাদপত্র পড় না কি?

বাঘ—যতজন সংবাদপত্র পড়ে তাহার অধিকাংশই পশু।

মানুষ—সত্যই তোমার নিকটে অনেক কিছু শিখিবার আছে। চল, তোমার গুলিটা বাহির করিয়া দিই।

বাঘ—ও বুঝিয়াছি। গুলি মারিয়া প্রাণের যে-টুকু বাকী আছে, সে-টুকু ওষুধ ও ছুরি দিয়া শেষ করিয়া দিতে চাও। কিন্তু তার প্রয়োজন নাই, নিজেদের অস্ত্রকে এত ব্যর্থ মনে করিয়া দুঃখ করিও না—গুলিতেই আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি মরিলাম।

এই বলিয়া বাঘটা মরিল—মানুষটা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নর-শার্দ্দুল সংবাদের এইখানেই সমাপ্তি।

নির্ব্বাণ

রাজার আজ কয়েক দিন হইল বড়ই চিন্তা। দীর্ঘ জটাধারী এক নাগাসন্ন্যাসী কয়দিন আগে রাজপুরীতে আসিয়াছিলেন, রাজার বিশেষ অনুরোধে খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—রাজকুমার সিদ্ধার্থ শীঘ্রই সংসার ত্যাগ করিবেন। কিনি রাজা হইবেন না বটে তবে রাজাধিরাজের ন্যায় সম্মানিত হইবেন। দীর্ঘ জটাধারী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাজার চিন্তা যাইতেছে না। রাজকার্য্যে তাঁহার মন নাই, আহার-নিদ্রায় তিনি বীতরাগ—নির্জ্জনে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতেছেন।

রাজপুত্রেরও মনের অবস্থা বড় সুবিধা নয়, এই অল্প বয়সেই সংসারটার ফাঁকি তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে বিধাতাপুরুষ কৌশলী ঘৃত-ব্যবসায়ী, সংসারে অতি অল্প পরিমাণ সুখের সঙ্গে প্রচুর মাত্রায় দুঃখ মিশাইয়া কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ইহাকে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। অধিকাংশ লোকই ঠকিতেছে। সংসারকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া অবশেষে অজীর্ণ ও অম্লরোগে ভুগিতেছে। কিন্তু তাঁহার কাছে বিধাতার ভেজাল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাজপুত্র ঠকিবার পাত্র নহেন। ছেলেবেলায় সেই আহত হাঁসটাকে দেখিয়া তাঁহার খট্‌কা লাগিয়াছিল বটে, তবে প্রাণীরা চিরজীবী নয়! আসলের পিছনে সুদের ন্যায় জীবনের পিছনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারপরে কিছুদিন কথাটা ভুলিয়া ছিলেন। প্রথম যখন বিবাহ করিলেন—মনে হইল, তবে বোধ হয় তাঁহারই ভুল; সংসারটা সত্য সত্যই বুঝি বিশুদ্ধ গব্যঘৃত। কিন্তু বেশিদিন এভাব থাকিল না, আবার দু-চারটি অধ্যাত্মিক উদ্গার উঠিল, রাজপুত্র বুঝিলেন—ইহাতে ভেজাল আছে।

বিশেষ, কয়েকদিন হইতে এই ভাবের বড়ই বাড়াবাড়ি হইতেছে, পদে পদে সংসারের ফাঁকি চোখে পড়িতেছে। সেদিন বাগানে বেড়াইতে ছেলেবেলার মার্ব্বেল খেলিবার গর্ত্তটা চোখে পড়িল। অমনি তিনি ভাবিত

হইয়া পড়িলেন। কে বলিল, এতটুকু গর্ত্তে এতখানি নীতিতত্ত্ব নিহিত আছে? তাঁহার মনে হইল, সংসারটা এমনি শত শত নৈতিক অধঃপাতের কূপে পরিপূর্ণ। তবে যে শাস্ত্রে বলে গোষ্পদে মানুষ ডুবিয়া মরে তাহা একেবারে মিথ্যা নয়। আর একদিন তাঁহার শিকার করিবার ধনুকখানি চোখে পড়িল; তিনি শিহরিয়া উঠিলেন মনে হইল—তিনিও অমনি আসক্তির রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ইল্লিশ মৎস্যের মত বাঁকিয়া গিয়াছেন। মায়া-পাশ ছিন্ন হইলেই সরল ভাব ধারণ করিবেন। শেষে এমন অবস্থা হইল, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই একটা তত্ত্বকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পান। ঢেঁকি, কুলা, ধামা, হাতা, খুন্তি, পিঁড়ি সকলের মধ্যেই নীতিকথা উগ্রভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীটাকে তাঁহার সুবৃহৎ একখানা বোধোদয়ের মত বোধ হইল। দৃশ্য জগতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপদ আরো বেশী। অন্ধকারের মধ্যে শত শত শর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে বৈরাগ্যের পথে চোখ মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। রাজকুমার প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পত্নীকে ফাঁকি দিয়া কিছু বেশী পরিমাণে সুধা পান করিলেন। নেশার ঝোঁকে তাঁহার মনে হইল, সংসারটা বেবাক মায়া; মনে হইল তাঁহার দুইখানা আধ্যাত্মিক ডানা গজাইয়াছে; ছাদের উপর হইতে লাফ দিবার চেষ্টায় ছিলেন; লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সেদিনেব ব্যাপার দেখিয়া পত্নী সুধার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া বাখিতেন। রাজপুত্র বুঝিলেন—ভেজাল, ভেজাল, সর্ব্বত্রই ভেজাল। সাধনার পথে নারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঁধা। তিনি সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন—বথ প্রস্তুত কব, আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইব।

॥ ২ ॥

পুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইবে শুনিয়া রাজা পরম আহ্লাদিত হইলেন, তবে বুঝি পুত্রের মতিগতি ফিরিল। তিনি তখনি নগরপালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, রাজপুত্র যে পথে যাইবে সে পথে যেন দুঃখের কোন লেশ না থাকে। কোটালের যষ্টি যাদুকরের যষ্টি না হইলেও তাহার দ্বারা অকালে অস্থানে হাসি বিকশিত করিয়া তুলিতে সে অভ্যস্ত; এমন মাঝে মাঝে প্রায়ই করিতে হয়। নগরের পূর্ব্বগামী পথে হাসির ব্যবস্থা সে করিল।

প্রত্যেককে পাঁচ 'ড্রম' মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার করিয়া হাজার জন লোক ভাড়া করা হইল, তাহারা পথের দুই পাশে সারিবন্দী দাঁড়াইয়া রহিল। রাজপুত্র বাহির হইলেই হাসিতে আরম্ভ করিবে। পাছে তাহারা কর্তব্যে অবহেলা করে, সেজন্য প্রত্যেকের পিছনে একজন করিয়া যষ্টিধারী প্রহরী মোতায়েন করা হইল! নিন্দুকেই শুধু বলিয়া থাকে যে, লাঠিতে কেবল কাঁদায়; প্রয়োজন হইলে লাঠির আঘাতে হাসানও চলে। সহরের সে অঞ্চল হইতে কাণা, খোঁড়া, দুঃখী, দুঃস্থদের তাড়াইয়া দেওয়া হইল।

রাজপুত্র রথে বাহির হইয়াছেন; হাজার জন 'দেখন-হাসি' হাজার জোড়া দন্ত-পঙক্তি বাহির করিয়া হাসিতেছে। তিনি এই বাধ্যতামূলক দন্ত-প্রদর্শনী দেখিয়া বুঝিলেন—জগৎ আনন্দময়। বিধাতা যে মানুষকে দাঁত দিয়াছেন, হাস্য করাই তার লক্ষ্য, রাজপুত্রকে দেখিলে হাস্য করাই তার উদ্দেশ্য, আহার করা নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু সৌভাগ্যবশত রাজকীয় দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ নয়, নতুবা তিনি দেখিতে পাইতেন—মাঝে মাঝে প্রহরীর লাঠির গুঁতা পিঠে পড়িতেছে, এবং হতভাগ্য পৃষ্ঠের মালিক কাঁপিতে কাঁপিতে হাসিতেছে।

রাজপুত্র চলিয়াছেন, কোথাও কোন বৈকল্য নাই, কেবল হাসি, গান, বাঁশী, হাসি আর হাসি! এমন সময়ে—ওকে? ও কি? পথের প্রান্তে ও লোকটা কে? এই হাসির ধ্রুপদের মধ্যে তাল কাটিয়া ও লোকটা কে প্রবেশ করিল? রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ওই লোকটা কে? ও কেন হাসির ঐক্যতানে যোগ দেয় নাই? দৃষ্টি উদাস, গতি উদাসীন, মুখ আসক্তিহীন, বেশ ম্লান, কিন্তু একদা যেন সৌখিন ছিল—ও লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, ও লোকটা বেকার?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে আবার কি? উহা ওর বংশগত, না সকলেরই হইতে পারে?

সারথি বলিল—সত্য কথা বলিতে কি কুমার, উহা ওর জন্মগত নয়, সকলেরই এমন অবস্থা হইতে পারে। রাজার ঘরে না জন্মিলে আপনিও বেকার হইতেন, আবার আপনি যদি নিজেই রথ হাঁকাইতে শেখেন তবে আমাকেও বেকার হইতে হইবে।

তিনি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেকার—কি করিলে হয়?

সারথি বলিল—তার চেয়ে বলুন কি না করিলে হয়? লোকটাকে আমি চিনি। গৌতমের চতুষ্পাঠির ছিল সেরা ছাত্র। ওরকম মেধাবী ছাত্র এ অঞ্চলে ছিল না। গৌতমের নীবার ধান্যের ক্ষেতে আগ্রহাতিশয্যে এত বেশী জল সেচন করিয়াছিল যে, অবশেষে ধানে পোকা লাগিয়া গিয়াছিল। তবুও গৌতমমুনি ওর উপরে রোগ করেন নাই। ব্রহ্মচর্য পরীক্ষায় ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখন বৃত্তিহীন! তাই ওর এই দশা।

রাজপুত্র—এই বেকারের পরিণাম কি?

সারথি—হয় ত রাজদ্রোহ করিবে, নয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, নয় বিবাহ করিবে।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্! সারথি রথ ফিরাও।

বিবেক-বিদ্ধ রাজপুত্র ফিরিয়া আসিলেন—রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

পাছে রাজপুত্র সংসার ত্যাগ করে সেই জন্য স্নেহময়, কর্ত্তব্য পরায়ণ, পুত্রের মঙ্গলকামী পিতা বাছা বাছা নটী আমদানী করিলে—নতাহারা সর্ব্বদা রাজপুত্রকে ঘিরিয়া থাকিবে। সৌন্দর্য্য, যৌবন ও বিলাসের প্রাচীরে এতটুকুও ফাটল না থাকে—যাহার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শীতবায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

॥ ৩ ॥

রাজপুত্র পরদিন আবার নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। নগরের পশ্চিম দিকের পথটাকে ভাল করে সাজান হইল; আগের দিনের চেয়ে কড়া পাহারা বসিল, যেন অবাঞ্ছিত কেহ না আসিয়া পড়িতে পারে। পথের দুই ধারে দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদের দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল; তাহারা বিচিত্র বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইয়া মূর্ত্তিমান বিজ্ঞাপনের মত শোভা পাইতে লাগিল।

যথাসময়ে রথে করিয়া রাজকুমার বাহির হইলেন; যেদিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করুন না, কেবল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সৌন্দর্য্য। পূর্ব্বদিনের আকস্মিক অভিজ্ঞতা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, তিনি সারথির দিকে তাকাইয়া মুগ্ধভাবে বলিলেন—সারথি, সংসার কত সুখের! তবে যে মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে দারিদ্র্যের কথা পড়ি, সেটা বুঝি উপন্যাস।

এমন সময় পথের এক পাশে—ও লোকটা কে? মুখে চোখে চকিত ভাব; গতি সন্ত্রস্ত, ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে মৃগশিশুর মত ভীত তাহার অবস্থা; খোলা ছাতি এদিকে ওদিকে মেলিয়া সর্ব্বদাই যেন নিজেকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছে? লোকটা কে? এই ঐশ্বর্য্যের মহাকাব্যের মধ্যে লোকটাকে একটা মারাত্মক ছাপার ভুলের মত দেখাইতেছে, তাই ত লোকটা কে?

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, লোকটা কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা ঋণী!

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—ঋণ কাহাকে বলে?

সারথি—শোধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও শোধ করিবার অঙ্গীকার করিয়া টাকা লওয়াকে ঋণ বলে।

বিস্মিত রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন,—আমাদের কি ঋণ আছে?

সারথি—রাজপুত্র, রাজাদের ঋণের নাম জাতীয় ঋণ! যে রাজার রাজ্য ও জাতীয় ঋণ যুগপৎ না বাড়িতে থাকে সে রাজাই নয়!

রাজপুত্র—এখন ইহার পরিণাম কি?

সারথি—হয় জেল, নয় উন্মাদাগার, নয় সাহিত্যসেবা।

রাজপুত্র গম্ভীর হইয়া আদেশ করিলেন—রথ ফিরাও।

আগের দিনের ও আজিকার যুগল অভিজ্ঞতা মিলিয়া তাঁহার মানসাকাশের অর্দ্ধেক যেন অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

মর্ম্মাহত পিতা খবর শুনিয়া নটীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন রাজপুত্র নগরের উত্তরগামী পথে ভ্রমণে বাহির হইলেন, পথের দুইদিকে সুন্দর দেহধারী সুপুরুষগণ দণ্ডায়মান, রাজপুত্র দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন,—সংসারে সুখ না থাকুক—স্বাস্থ্য আছে, প্রফুল্লতা আছে, যাহা হৌক, মন্দর ভাল। এমন সময়ে ফিরিবার মুখে দেখিতে পাইলেন, একজন মানুষ, প্রায় তাহাকে অমানুষ বলিলেই চলে।

বলিচিহ্নিত কপাল, শুষ্কগণ্ড, কোটরগত চক্ষু, শীর্ণ অধর, আধ-পাকা দাড়ি, কেবল উদ্ধত নাকটা একটা উগ্র জয়ধ্বনির মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! উঠিয়াছে! ক্ষীণ দেহ, পদে পদে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত।

ভীত রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি, ওই প্রেতোপম লোকটি কে?

সারথি বলিল—রাজপুত্র, লোকটা কেরাণী।

রাজপুত্র—কেরাণী কাহাকে বলে?

সারথি—যাহার আত্মহত্যার নাম চাকুরী।

রাজপুত্র—লোকটাকে প্রায় অন্ধ বলিয়া মনে হইতেছে; কি করিয়া হইল?

সারথি—টাকার হিসাব রাখিতে রাখিতে।

রাজপুত্র—তাহার এতই যদি টাকা তবে এ দুর্দ্দশা কেন?

সারথি—টাকা ওর নিজের নয়।

রাজপুত্র—তবে কাহার?

সারথি—কাহার, তা আমিও জানি না—ও লোকটাও জানে না—কাহার টাকা. কিসের টাকা, কেন রাখা হইতেছে, কবে কি প্রকারে খরচ হইবে—উহার তাহা জানিবার উপায় নাই, ও কেবল অন্ধকার বদ্ধ ঘরে বসিয়া অঙ্কের পরে অঙ্ক পাত করিয়া গণনা করিয়া যাইতেছে; গণনা করিতে করিতে চক্ষু অন্ধ, স্বাস্থ্য নষ্ট, মন নিরানন্দ হইতেছে, অবশেষে হয় তো একদিন টাকার গাদার উপরে পেটের ক্ষুধা লইয়া হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়িয়া মরিবে। উহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজন ওখানে আসিয়া বসিবে। ইহাই ইহার জীবনের—কিম্বা সত্য কথা বলিতে কি—মরণের ইতিহাস।

রাজপুত্র—তবে শুনিয়াছি, আইনের চক্ষে সকলেই সমান আইন উহাকে রক্ষা করে না কেন?

সারথি—সমান বলিয়াই তো রাজার এবং ওই লোকটার দুইজনেরই ভিক্ষা করা নিষেধ; ফুটপাতে শুইয়া থাকা নিষেধ আত্মহত্য করা নিষেধ।

রাজপুত্র নীরব রহিলেন। সারথি বলিয়া যাইতে লাগিল—যেন রাজা সর্ব্বদাই ভিক্ষা করিতে উদ্যত—কেবল আইনের ভয়ে পারিতেছেন না, যেন আত্মহত্যা ছাড়া তাঁহার দুঃখের হাত হইতে মুক্তি নাই—কিন্তু ন্যায়ের দণ্ড উত্থিত।

রাজপুত্র বলিলেন—সংসারে ধিক্, ফিরাও।

॥ ৫ ॥

রাজপুত্র সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন—সংসারে সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবল বেকার ঋণী ও কেরাণীতে পূর্ণ। জীবনের ইহাই তো পরিণাম, তবে এ সংসার ত্যাগ করা ভাল কিন্তু ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, কোন নূতন জীবনকে তিনি গ্রহণ করিবেন? সারা রাত্রি জাগিয়া এই চিন্তা তিনি করিয়াছেন।

পরদিন পুনরায় তিনি নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন—এবার দক্ষিণগামী পথে। আগে তিন দিন পথ-সজ্জায় প্রচুর খরচ হইয়াছে অথচ সে-পরিণামে ফল হয় নাই দেখিয়া এবার আর পথ সাজানো হয় নাই। তবে স্বভাবতই নগরের দক্ষিণ অঞ্চল সুসজ্জিত রাজপুত্র সংসারের ভাল-মন্দ যাহা কিছু দৃশ্য দেখিতে চলিলেন। তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—সংসার ত্যাগ করা হইতেছে না।

এমন সময়ে অদূরে—ওই কে যায়? তিনি চমকিয়া উঠিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথি ও লোকটা কে? মুখে হাসি, চোখে চশমা, মাথায় কেশদাম ও সীঁথি, গালে পাউডার ও অধরে সিগারেট, স্কন্ধে ভূলুণ্ঠিত কোঁচায় যেন ধূলা ঝাট দিতেছে, জুতা জোড়া এত উজ্জ্বল যেন মুখ দেখা যায়, আর দুইপাশে তাহার অনুরূপ তরুণীগণ নানা বাদ্যযন্ত্র বহন করিতেছে, কাহারো কাহারো হাতে সুধার পাত্র। ওই লোকটা কে? দেয়ালে দেয়ালে ওই যে বিভিন্ন অবস্থার চিত্র উহা যেন ইহারই, চিরযৌবনরূপী এই লোকটি কি কন্দর্প?

সারথি বলিল—না রাজপুত্র, লোকটা ফিল্মষ্টার।

রাজপুত্র যেন আপন মনেই বলিলেন—কে বলিল—সংসারে সুখ নাই। এতদিন পরে রাজপুত্র যেন সুখের সন্ধান পাইয়াছেন।

সারথি বলিল—রাজপুত্র, সিনেমা অ্যাক্টরই আজকাল সমাজের আদর্শ ছেলেরা উহারই মত করিয়া বই পড়িতেছে না, যুবারা উহারই মত করিয়া জামা পরিতেছে, মেয়েরা সিনেমা-অভিনেত্রীদের মত করিয়া বস্ত্র পরিতেছে অর্থাৎ প্রায় না-পারিতেছে, সেই রকম করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সেইরূপ—

'ঘর কৈনু বাহির,
বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'

আদর্শকে পালন করিতেছে। উহারাই এ যুগের অবতার। এ জীবনে দুঃখ নাই, জরা নাই, বার্দ্ধক্য নাই, শোক নাই, ঋণ নাই, স্বাধীনতার খর্ব্বতা নাই, ইচ্ছার প্রতিরোধ নাই, বোধ হয় মৃত্যুও নাই। কেবল হাসি, বাঁশী, গান, যৌবন, বসন্ত আর বঁধু, কেবল সখা আর সখী, তুমি আর আমি, আর কেবল—তা তা থৈ থৈ।

সারথির বর্ণনা শুনিয়া রাজপুত্রের একবার সন্দেহ হইল—সে বোধ হয় সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। রাজপুত্রের মনে হইল যে, এতদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় পাওয়া গেল।

রাজপুত্র বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আবার বন্ধন!

সেইদিন গভীর রাত্রে রাজপুত্র একাকী সংসার ত্যাগ করিলেন; সকলে ভাবিল রাজপুত্র কোথায় গিয়াছেন! তিনি সোজা দক্ষিণ-অঞ্চলের পবিত্রারণ্য নামক সিনেমা কোম্পানীতে গিয়া যোগ দিলেন। এখনে তিনি নাম ভাঁড়াইয়া সিনেমায় অভিনয় করিতেছেন। এখন তিনি একজন বিখ্যাত ষ্টার কিন্তু মনে কি শান্তি পাইয়াছেন? নিকটবর্ত্তী সিনেমা অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

বাঘ্‌ দত্তা

রাণুর সঙ্গে রজত রায়ের আজ তিন মাস ধরিয়া পূর্ব্বরাগের পালা চলিতেছে, কিন্তু কিছু সুবিধা হইতেছে না। উভয় পক্ষ ধনী, বিবাহে কোন বাধা নাই, তবুও। রজত ইতিমধ্যে তিন বার মোটর ও চার বার বাসা বদল করিয়াছে, সাধনা অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে, সিদ্ধির দিকে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আসল কথা, প্রত্যেকের একটি করিয়া মর্ম্মস্থান আছে, সেখানে হাত না-পড়া পর্য্যন্ত সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই মর্ম্ম এত অবারিত যে হাত দিতেই সেখানে পড়ে। দু-এক জনের মর্ম্ম সত্যই রহস্যময়, আমাদের রাণু সেই দলের। রজত কি ছাই এত কথা বোঝে, না তাহার ভাবিবার সময় আছে! সে নিয়ত আসে যায়, রাণুর সঙ্গে গল্প করে, গান শোনে, চা খায়; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে মুখ গম্ভীর করিয়া মোটর হাঁকাইয়া বাড়ী ফেরে। অবশেষে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রজতের ব্যারিষ্টার পিতা তাহাকে শুভবিবাহের এক মাসের নোটিশ দিলেন। শুনিয়া রজত তৃতীয়তম মোটর হাঁকাইয়া রাণুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণুর কাছে খবর গেল। রজত বসিয়া টেবিলের বই লইয়া নাড়িতে লাগিল। হাঁ, একটা কথা অনাবশ্যক মনে করিয়া বলি নাই, বিশেষ, শুনিলে হয়ত রাণুর উপরে পাঠকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতে পারে, এমন কথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু আর গোপন করিয়া ফল নাই, রজতের হাতে এখনই তাহা ধরা পড়িবে। রাণু মহাভারত পড়ে পয়ারে বাঁধা খাস কাশীদাসী গ্রন্থ।

বই নাড়িতে নাড়িতে রজত একখানি কাশীদাসী মহাভারত আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বহু অধ্যয়নের চিহ্ন তাহার মার্জ্জিনে। তাহাতে ছোট

বয়সের মোটা অক্ষর ও বড় বয়সের ছোট অক্ষর সবই আছে। সে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ দেখিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পাতায় লেখা আছে, "উঃ, অর্জ্জুন কত বড় বীর। নিশ্চয় অনেক বাঘ সে মারিয়াছে।" আবার, আর এক পাতায় ভীমের বক রাক্ষস বধের ছবির তলায়,—"ভীম না জানি কত বাঘ মারিয়া ফেলিয়াছে।" এক, দুই, তিন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রজতরঞ্জনের মনে একটা দিব্যদৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! এমন দিব্যদৃষ্টি লাভ জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। রজত মহাভারত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভদ্রলোকের মত বসিল। রাণু প্রবেশ করিতে সে বলিয়া উঠিল—রাণু আমায় দিন পনরর ছুটি দিতে হবে!

কেন?

একবার সুন্দরবনে যাব।

রাণু ঠাট্টার স্বরে বলিল, জমিদারী দেখতে বুঝি,—নায়েবরা খুব চুরি করছে!

রজত বলিল, হাঁ, জমিদারীও দেখা দরকার আর ঐ সঙ্গে গোটাকয়েক বাঘও মারব!

'বাঘ'! রাণু চমকিত হইয়া উঠিল! রজত আড়চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিল!

আপনি বাঘ মারতে পারেন? কই আমাকে ত বলেন নি?

রজত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, হামেশাই ত মারছি, কত বল্‌ব। আমি যে দু-বেলা ভাত খাই, তা-ও ত তোমাকে বলি নি?

রাণু বিস্মিত ভাবে বলিল, কিন্তু আপনাকে দেখে ত মনে হয় না যে আপনি বাঘ মারেন।

রজত চেয়ার হেলান দিতে দিতে বলিল, আমাকে দেখে কার কি মনে হবে সেজন্য কি আমি দায়ী?

আপনি ক'টা বাঘ মেরেছেন?

হবে পঞ্চাশ ষাটটা।

তার মধ্যে রয়াল বেঙ্গল কটা?

রজত হাসিয়া বলিল, রয়াল বেঙ্গল ছাড়া ত আমি অন্য কিছু মারিনে। রাণু এতক্ষণ বসিয়াছিল, এবার দাঁড়াইয়া উঠিল; কহিল চলি তবে।

না, না, একটু বসুন ; চা খেয়ে নিন।

চা হইল, জলযোগ হইল। রজত চা পান করিয়া বুঝিল আজকার চায়ে চিনির সঙ্গে রাণুর অনুরাগ মিশিয়াছে।

রজত জিজ্ঞাসা করিল, কি বল রাণু, তোমার জন্য একটা বাঘ আনব না কি ?

রাণু বিস্মিত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, বেশ মজা হবে, বেশ মজা হবে।

রজত ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, জ্যান্ত না মরা ?

রাণু ভীতভাবে বলিল, জ্যান্ত ? না, না, সে হবে না।

আচ্ছা তবে মরাই আনব, এই বলিয়া রজত উঠিয়া পড়িল।

রাণু দুয়ার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল, একবার থামিল, একবার ইতস্ততঃ করিল, একবার কাশিল, তার পরে বলিয়া উঠিল, না-হয় বাঘ শিকারে নাই গেলেন !

রজত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

রাণু লজ্জাজড়িত উৎকণ্ঠার সহিত বলিল, তবে একটু সাবধানে থাকবেন। কবে আসবেন ?

দিন পনরর মধ্যে বলিতে বলিতে রজত আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল। রজত আজ রাণুর চোখে এমন একটি আশ্বাসভরা দীপ্তি এবং সিক্তপ্রায় আঁখিপল্লবের ভঙ্গী দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে সে বুঝিল বহুদিন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া দূরে দীপের আলো দেখিয়া কলম্বসের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল আর কি সান্ত্বনা পাইয়াছিল সেই হতাশ নাবিক সমুদ্রের জলে সদ্যভগ্ন বৃক্ষপল্লবের সাক্ষাতে।

দিন পনর পরে একদিন বিকালে রাণুদের বাড়ীতে রজতের মোটর আসিয়া থামিল। রজত লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পাঁচ-সাত জন লোকের সাহায্যে টানিয়া নামাইল প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাণুর এতদিন উৎকণ্ঠায় কাটিতেছিল, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল ; দেখিল সত্য সত্যই তাহার বাঘ আসিয়াছে, একেবারে খাঁটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার

রাণু বিস্ময়ে, ভয়ে, গর্ব্বে, উল্লাসে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সবলে মাপিয়া দেখিল বাঘটা নাক হইতে লেজের ডগা পর্য্যন্ত পাকা নয় ফুট।

রজত রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, রুমালে রক্ত কিসের? আপনার?

রজত হাসিয়া বলিল, বাঘের।

রাণু ছোঁ মারিয়া রুমাল কাড়িয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল; রজত তাহাকে অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে কি হইল জানি না। কিন্তু যখন রজত বাহিব হইয়া আসিল তাহার মুখে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের গর্ব্ব ও তৃপ্তি।

রজত রাণুর বাপের কাছে তাহার প্রার্থনা জানাইল। তিনি তাহার করমর্দ্দন করিলেন। পরের দিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। রাণু রজতের বাগ্‌দত্তা বধূ।

বিবাহের দিন পয়লা বৈশাখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজত প্রত্যহ আসে, গল্প করে, চা খায়, রাণুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়ী ফেরে সেদিন বাঘ শিকারের গল্প হইতেছিল। রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি গাছে উঠে বাঘ মার?

বজত সিগারেটে টান মারিয়া বলিল, প্রথমে তাই করতাম, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মারি!

রাণু শিহরিয়া উঠিল।

আচ্ছা ক'টা গুলিতে বাঘ মরে?

একটা! দেখ নি বাঘটাব দুই চোখের মাঝখানে গুলির দাগ!

বাণু দেখিয়াছে বটে।

অনেক রাতে রজত উঠিয়া গেল। রাণু যাইবার সময় তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে সে আর বাঘ মারিবে না। কিন্তু রজত কি প্রতিজ্ঞা করিতে চায়! শিকাব না করিতে পারিলে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি! অবশেবে অনেক অনুযোগ, অনুরোধ, অভিমানের পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বজত প্রতিজ্ঞা করিল। রাণুব বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল, রজত সত্য সত্যই তাহাকে ভালবাসে নহিলে এত বড় ত্যাগস্বীকার করিবে কেন?

রাণু বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শিকারের কাহিনী, সুন্দরবনের গভীর অরণ্য; পালে পালে হরিণ, ইতস্তত বাঘ; যেখানে-সেখানে অজগর-সাপের দল। তার মধ্যে একাকী বন্দুকধারী বীরপুরুষ! উঃ তার কল্পনা বাধা

পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এমন স্বামী-সৌভাগ্য তার হইবে সে কখনই ভাবে নাই। রাত এগারটা বাজে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল; দেখিল রজত একখনি বই ফেলিয়া গিয়াছে, আধুনিকতম একখানা কন্টিনেন্টাল উপন্যাস! রাণু বইটি লইয়া বিছানায় আসিয়া শুইল। বইখানা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে কি মন বসে! প্রথমেই দুই রুগ্ন যুবক-যুবতীর চা-পানের কাহিনী! কোথায় সুন্দরবনে বাঘ-শিকার, আর কোথায় চা-পানের গল্প! নাঃ, জীবনে যদি কোথাও রোমান্স থাকে তবে তাহা ওই সুন্দরবনে। রাণু বই ফেলিয়া দিল। পাতার মধ্য হইতে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। বোধ হয় রজত পাতায় চিহ্ন রাখিয়াছে মনে করিয়া রাণু কাগজখানা তুলিল, দোকানের বিল। রজতের নাম দেখিয়া রাণু পড়িল, লেখা আছে—
Supplied to Mr. Rajat Ranjan Roy, a Royal Bengal tiger measuring nine feet from head to tail for Rs. 350 only less advance Rs. 100—Rs. 250 only.

হাঁ, দোকানের বিলই বটে। একেবারে সাহেবী দোকানের। ম্যানেজারের অস্পষ্ট নাম-সহিটি পর্য্যন্ত নির্ভুল। বিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাণুর মগজের মধ্যে এক ঝলক দিব্যদৃষ্টি খেলিয়া গেল এবং সে ভারী একটি স্বস্তি অনুভব করিল।

ইহার পরে ঘটনা সংক্ষেপ। পাঠক ভাবিতেছেন বিবাহ ভাঙিয়া গেল। বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। রাণু কোনদিন সে বিলের কথা রজতকে জানায় নাই। রজত মাঝে মাঝে শিকারে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। রাণু তাহাকে প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিত। সে নয় ফুট দীর্ঘ বাঘটার মাথা রাণুর বসিবার ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইল। রাণু তাহার তলায় লিখিয়া দিল—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। রজত চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও আবার কি?

রাণু বলিল, ও একটা সখ!

রজত নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিল ওটা বোধ হয় রাণুর একটা মহাভারতীয় সংস্কার।

নগেন হাড়ীর ঢোল

ডুম্, ডুম্, ডুম্,···ডুম্, ডুম্, ডুম্,···আঃ, কান ঝালাপালা হইয়া গেল। রাত নাই, দিন নাই কেবলই কি ঢোলের বাজনা ভাল লাগে! সকালে, বিকালে, দুপুরে,—হাটে, বাজারে.পথে—সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কেবল ঢোলের শব্দ! গাঁয়ের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। না হয় সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—তাই বলিয়া কি কারো কাজকর্ম্ম নাই—আর নিষ্কর্ম্মা লোকের এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে সারাদিন বসিয়া তাকে ঢোলের শব্দ শুনিতে হইবে!

সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না—সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলি—কখন কার দরকার হয়!

গাঁয়ের নাম জোড়াদীঘি—এক সময়ে মস্ত গ্রাম ছিল—এখন থাকিবার মধ্যে ঐ নামটি আছে। তখনকার কালে আদমশুমারির ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আদমি এতই ছিল যে উপকথার শিয়ালের কুমীরের ছানা দেখানোর মত এক জনাকে সাতজনা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইত না।

গাঁয়ে জেলে ছিল এমন পঞ্চাশ-ষাট ঘর, নদী মরিয়া গেল, জেলেরা ঘর-বাড়ী বেচিয়া বড় নদীর ধারে উঠিয়া গেল, পঞ্চাশ-ষাটখানা শূন্য ভিটা শীতের রোদে নদীর চরে একপাল কাছিমের মত পড়িয়া রহিল।

আট দশ ঘর ছুতোর ছিল—কতক মরিল, কতক জাতব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া চাষবাস ধরিল, কতক অন্য গাঁয়ে উঠিয়া গেল।

কামার ছিল চার-পাঁচ ঘর—জোড়াদীঘির জাঁতি ও কাটারি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। নদী মরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে তারা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে হাতুড়ি চালাইবার ক্ষমতা আর তাদের রহিল না, প্রথমে হাতুড়ি গেল, তারপরে হাত গেল,—ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; বোধ হয় এখন তারা গোপনে শুধু সিঁধকাঠি তৈয়ারী করিয়া থাকে—গাঁয়ে বড় সিঁধেল চোরের উপদ্রব।

ধোপা কাপড়কাচা ছাড়িয়া চৌকিদারী চাকরী লইল ; নাপিতের আর জাতব্যবসা করিয়া চলে না—সে বেগুন ও কলার চাষ আরম্ভ করিল, গাঁয়ের লোকে দাম দিতে গোলামাল করে দেখিয়া গোয়ালা ভিন্ গাঁয়ে দই ক্ষীর বেচিতে লাগিল—ইহা দেখিয়া গাঁয়ের কয়েকজন লোক অপমানিত বোধ করিয়া এক দিন রাত্রে তাকে ধরিয়া মারিল—পরের দিন সে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নাজিরপুর চলিয়া গেল।

গ্রামের জমিদারের অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল, কিন্তু নদীর সঙ্গেই সব যোগ—নদী মরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা মরিতে লাগিল—জমি পলাতক পড়িতে লাগিল—খাজনা অনাদায় হইল—ক্রমে জমিদারির ক্ষীণ স্রোত শনৈঃ শনৈঃ মহাজনের সিন্দুক-সঙ্গমের অভিমুখে চলিল—এখন তার শুধু নামটা আছে, আর আছে পৈত্রিক প্রকাণ্ড বাড়ী—চূণকামের অভাবে প্রতি বছর তার মুখ আরও একটু করিয়া কালো হইতেছে।

গ্রামের এ অবনতির জন্য দোষ কার ?

সকলে একবাক্যে বলে—অদৃষ্ট! কিন্তু পদ্মায় নাকি কোথায় একটা প্রকাণ্ড পুল বাঁধা হইয়াছে—দুই ধারে পাথর ঢালিয়া পাহাড়-প্রমাণ উঁচু করা হইয়াছে, জোড়াদীঘীর নদীর মুখ পুলের উজানে—সেখানে মস্ত চড়া পড়িয়াছে—দেখিতে দেখিতে পঁচিশ বছরের মধ্যে নদী শুকাইয়া গেল। আমরা জানি গ্রামের ধ্বংসের মূলে ঐ পুল—লোকে বলে অদৃষ্ট—কি জানি হইতেও পারে—এদেশে সবই সম্ভব ?

এবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি জন্য গাঁয়ে লোক সারাদিন ঢোলের শব্দ সহ্য করে। আগে অনেক ঘর বাড়ী ছিল—তারাই বাজনাদারের কাজ করিত। একবার বৈশাখ মাসে কলেরা লাগিল, (পল্লী-অঞ্চলের ছয় ঋতুর প্রভেদ ছয় ব্যাধির দ্বারা বোঝা যায়) হাড়ীপাড়া সাফ হইয়া গেল—কেবল রমেশ হাড়ীর ছয় বছরের নাবালক ছেলে আর স্ত্রী বাঁচিল। ছেলেকে সঙ্গে করিয়া রমেশের স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—এ দশ বছর গাঁয়ে ঢুলি ছিল না—পালপার্ব্বণের সময়ে লোকে বিপদে পড়িত—অনেক বেশী খরচ করিয়া অন্য গ্রাম হইতে ঢুলি আনিতে হইত।

হঠাৎ আজ কয়েক দিন হইল রমেশ হাড়ীর ছেলে নগেন গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সে আর মামার বাড়ী থাকিতে রাজী হইল না।

প্রথমে প্রতিবেশীরা তাকে চিনিতে পারিল না—তাদের দোষ দেওয়া যায় না, ছয় বছরের ছেলে দশ বছর পরে ফিরিলে চেনা সহজ নয়। নগেন আত্মপরিচয় দিল, প্রতিবেশীদের রমেশকে মনে পড়িয়া গেল—শুধু তাই নয়, সকলেই সহসা নগেনের মুখে, চোখে, হাবভাবে, কথা-বার্তায় রমেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। কেহ বলিল—রমেশই যেন ষোল বছরের হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিল—হাজার লোকের মধ্যেও তাকে রমেশের ছেলে বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। নগেন প্রতিবেশীদের দৃষ্টিশক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিল—কিন্তু জানিত না আরও বিস্ময় তার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

নগেনের মা জোড়াদীঘি ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যাইবার সময়ে তৈজস, খান-দুই তক্তপোষ, একটা কাঠের সিন্দুক এবং একটা ঢোল প্রতিবেশীদের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল—নগেন সেই পৈতৃক সম্পত্তিগুলি দাবি করিতেই প্রতিবেশীদের নানা রকম অনিবার্য্য কাজ মনে পড়িয়া গেল—তারা মূঢ় নগেনকে ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

তারপরে নগেন তাগিদ আরম্ভ করিল,—হাঁটাহাঁটি করিল, কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু নশ্বর তৈজসপত্র আর ফিরিয়া পাইল না। তার সবচেয়ে লোভ ছিল ঐ সিন্দুকটার উপরে—বহুদিন সে মার মুখে পৈত্রিক সিন্দুকের কথা শুনিয়াছে; তার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সিন্দুকটার মধ্যে তার পিতার সারা জীবনের সঞ্চয় রহিয়াছে—একবার তাহা পাইলে তার আর অভাবঅভিযোগ থাকিবে না।

তিনু ধোপার (এখন সে চৌকিদার) বাড়ীতে সিন্দুকটা ছিল; নগেন দাবি করিতে সে স্পষ্ট বলিয়া দিল হঁ্যা একটা কাঠের বাক্স ছিল বটে ওইখানে প'ড়ে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না—বোধ হয় উই ইঁদুরে কেটে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সংসারের কোন বস্তুই যে অবিনশ্বর নয়, এই ঘটনায় নগেন তার প্রথম প্রমাণ পাইল—সে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সংসারে সবাই অসাধু নয়। মোতি ছুতোর একদিন বিকাল বেলা একটা ঢোলের খোল আনিয়া নগেনকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তার মা যাইবার সময়ে এই খোলটা তার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল—এত দিন সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; এ দায়িত্ব আর সে বহন করিতে পারে না—যার জিনিষ সে গ্রহণ করুক। এই বলিয়া সে অতি জীর্ণ উইয়েকাটা ঢোলের

কাষ্ঠ-গোলকটি নগেনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল—নগেন খোলের ফাঁকের ভিতর দিয়া নদীর ওপারের ঢালু মাঠের বাবলা বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন সে খোলটা ঘাড়ে করিয়া জমিদার-বাড়ীতে গিয়া জমিদার তারানাথ বাবুর কাছে আত্মপরিচয় দিল। তারানাথবাবু রমেশকে জানিতেন; নগেন ফিরিয়া আসাতে তার এক ঘর প্রজা বাড়িল, কিছু আয়বৃদ্ধি হইল, মানসাঙ্কে বিদ্যুতের মত ইহা খেলিয়া গেল; তিনি তাকে ঘর তুলিবার জন্য সাহায্য করিলেন—আর ঢোলটা চামড়া দিয়া আচ্ছাদন করিয়া লইবার জন্য নগদ পাঁচসিকা তার হাতে দিলেন।

নগেন লক্ষ্মীপুরের হাটে গিয়া খোলটাকে পালিশ করিয়া রং করাইয়া লইল; মুচি দিয়া চামড়া লাগাইল—আর পালকের সাজ পরাইয়া ঢোলকটাকে একেবারে নূতন করিয়া ফেলিল। তারপরে সগৌরবে সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। গাঁয়ের লোক নগেন হাড়ীর ঢোল দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক এত দিনে গাঁয়ের বাজনার অভাব দূর হইল।

॥ ২ ॥

নগেন হাড়ীর ঢোলের অবিরাম বাজনায় গাঁয়ের লোকে বিরক্ত হইলেও এই সব নানা কারণে সকলে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

হরিচরণ জোড়াদীঘির একজন জালহীন জেলে, চাষবাস করিয়া খায়। অন্য জেলেরা গ্রাম ছাড়িয়া গেল, হরিচরণ যাইতে পারিল না; লোকের কাছে সে বলিয়া বেড়াইল, সাত পুরুষের ভিটা কি ত্যাগ করা যায়! আসল কথা অন্য রকম: হরিচরণ গাঁজা খায়; জোড়াদীঘি ছাড়া আবগারির দোকান আশপাশের গাঁয়ে নাই, কাজেই সেই জোড়াদীঘি ছাড়িতে পারিল না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে সে বাজারে আবগারির দোকানের দিকে যায়—ফিরিবার সময়ে তুরীয় অবস্থায় ফেরে; এখন, বাজারের পথের পাশেই নগেন হাড়ীর ঘর। সেদিন সন্ধ্যায় হরিচরণ বাজার হইতে ফিরিতেছে, এমন সময় তার কানে গেল—ঢোলের ডুম্, ডুম্, ডুম্। হরিচরণ ঢোলের

তানে তালে বলিয়া উঠিল—ডুম্, ডুম্, ডুম্ ; এক বার, দুই [redacted] তিন বার। নগেন রাগিয়া গিয়া নিষেধ করিল—জেলের পো ঠাট্টা ক'রো না বলছি। জালিকপুত্রের তখন চতুর্থ অবস্থা ; সে উচ্চতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ডুম, ডুম, ডুম।

নগেন দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল, নামিয়া আসিয়া ঢোলের কাঠি হাতে তার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—ফের ঠাট্টা ?

হরিচরণ ঈষৎ রাগিয়া উত্তর দিল—তোর ঢোলে তুই যা খুশী বলিস, আমার মুখে আমি যা খুশী বলব, ঠেকায় কে !

ঠেকাই আমি—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ নগেন ঢোলের কাঠি দিয়া হরিচরণের পিঠে আঘাত করিল। অমনি যায় কোথা—দুই জনে হাতাহাতি বাধিয়া গেল ; হরিচরণের বয়স বেশী, তাতে নেশাগ্রস্ত, সে পড়িয়া গিয়া আহত হইল , কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া দুই জনকে নিরস্ত করিল।

পরদিন গাঁয়ের লোকে ঘটনা শুনিয়া রাগিয়া গেল, কেহ বলিল—যত বড় মুখ নয় তত বড কথা , কেহ্ বলিল—যত বড় ঢোল নয় তত বড় বোল , হরিচরণ পিঠের আঘাত স্মরণ করিয়া বলিল, যত বড় কাঠী নয় তত বড় ঘা। কিন্তু কেহ নগেনকে কিছু বলিতে সাহস করিল না—সে জমিদারের অনুগৃহীত জীব।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে জমিদারের প্রথম পৌত্রের জন্ম হইল , নগেনের বাজনা এব আগে কেবল দিনে চলিত, এবার অহোরাত্রব্যাপী হইয়া উঠিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—কর্ত্তার নাতির ভাতে বাজাতে হবে না ! তাই হাতটা সই ক'রে নিচ্ছি। বড়লোকেব ব্যাপার, বাজনা খাবাপ হ'লে লোকে বলবে কি ?

হরিচবণের ঘটনাকেও লোকে প্রয়োজনের আশায় সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আর একটা ঘটনায় লোকের সে-আশাও ভঙ্গ হইল। রতন মুচির ঘব গাঁয়ের প্রান্তে ; লোকটা ভালমানুষ অর্থাৎ জিনিষ লইয়া নগদ দাম দেয়, এবং জুতা সারিয়া দিয়া পয়সার জন্য তাগিদ করে না। এ হেন বতনের একটি পুত্র-সন্তান হইল—গাঁয়ের লোক উল্লসিত হইয়া উঠিল, আশা করিল রতনের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ধারা তার পুত্রের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

কয়েক দিন পরে রতন নগেনের বাড়ীতে গিয়া একটা সিকি তার সম্মুখে

ফেলিয়া দিয়া বলিল—ভাই একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে, মানে কিনা, আজ ষষ্ঠীপুজো একটু বাজিয়ে আসতে হবে।

নগেন তার সিকিটা পা দিয়া ঠেলিয়া বলিল—মুচির ছেলের ষষ্ঠী-পুজোতে আমার ঢোল বাজে না।

রতন তার যুক্তি না বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঢোলের কি আবার জাত আছে নাকি ?

—তবে রে জাত তুলে কথা ?—নগেন লাফাইয়া উঠিল। রতন সিকিটা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল; পথে সে একবার বাজারে গিয়া ঘটনাটা সকলকে বলিয়া বুঝাইয়া দিল, গাঁয়ের লোকের আশা সফল হইবার নয়, নগেন সকলের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে ঢোল ঘাড়ে করিয়া যাইবে না!

একজন জিজ্ঞাসা করিল—তবে ওর চলবে কি করে ?

রতন বলিল—কেন, জমিদারের নাতির ভাতে সে বাজাবে! সেই জন্যই তো ও দিনরাত হাত তামিল করছে।

কিন্তু আর তো অনেক দেরি!

হরিচরণ কাছেই বসিয়াছিল; পিঠের ব্যথা তার তখনো যায় নাই, নগেনের ব্যবহারে সে জমিদারের উপরে চটিয়া গিয়াছিল, সে গলা একটু খাটো করিয়া বলিল—ক'দিন সবুর কর না, দেখ কার ভাতে কে ঢোল বাজায়!

সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল—ব্যাপার কি ?

হরিচরণ আরও গলা খাটো করিয়া বলিল—বেশীদিন আর জমিদারি করতে হবে না! মছলন্দপুরের বাবুরা অনেক টাকার ডিক্রী করেছে—সব গেল ব'লে! তখন দেখা যাবে বেটা কার ভাতে ঢোল বাজায়!

আবগারি-ওয়ালার রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে বলিল—ঢোল বাজাবে বই কি! ভাতে নয় নীলামে।

ঘটনা সত্য কি মিথ্যা সে প্রশ্ন কেহ করিল না, অন্যের বিপদ যে এত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই সকলে খুশী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

॥ ৩ ॥

জমিদার তারানাথবাবুর অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, বাইরের ভানটি শুধু বজায় আছে, কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না, তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তি পত্তনী সম্পত্তি; বছর-শেষে মালেক জমিদারকে মোটা টাকা খাজনা

দিতে হয়; এর মস্ত অসুবিধা এই যে খাজনা চার বছর পর্য্যন্ত বাকি ফেলা চলে, লাটের খাজনার মত কিস্তি কিস্তি শোধ করিতে হয় না। চার বছরের খাজনা সুদে-আসলে দশ-বার হাজার টাকায় মত হইল; মালেক জমিদার নালিশ করিল; আদালতের কৌশলে যত দূর ঠেকানো সম্ভব তারানাথবাবু ঠেকাইল; কিন্তু আর ঠেকে না; মালেক জমিদার তারানাথবাবুর ভূসম্পত্তি নীলামের জন্য পরোয়ানা বাহির করিল।

ব্যাপারটা গ্রামে চাপা ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারের কর্ম্মচারীদেরই মুখরতার অবকাশে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই নগেন যখন জমিদারের পৌত্রের অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অদৃষ্ট নীলামের জন্য ঢোল বাজাইবার একটা কারণ প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

নগেন গ্রামের মধ্যে নিতান্ত একা। বয়স্কদের সঙ্গে তার মেলে না, তারা তাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; হরিচরণও রতনের ঘটনার পর হইতে কেহ আর তাকে দেখিতে পারে না। সমবয়স্কদের নগেন এড়াইয়া চলে; তার ধারণা সকলেরই লক্ষ্য তার ঢোলের উপরে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথমে তার সমবয়স্ক বালকেরা তার বাড়ীতে আসিত, গল্পগুজবও করিত এবং মাঝেমাঝে ঢোলটা লইয়া তাতে নানারূপ বোল তুলিবার চেষ্টা করিত। নগেনের ইহা ভাল লাগিত না, প্রথমে প্রথমে সে মুখে নিষেধ করিত; একদিন একজনকে কড়া করিয়া বলিল, আর একদিন আর একজনকে দু-ঘা চড় বসাইয়া দিল, তারপরে ঢোল ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত; শেষে অবস্থা এমন হইল যে, কেহ তার বাড়ীতে আর আসিত না। নগেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে সারাদিন বসিয়া কখনও ঢোলটাকে নূতন রঙ লাগাইত; কখনও নূতন পালকের সাজ বসাইত: আর জমিদারের নাতি জন্মিবার পর হইতে অদূরবর্ত্তী অন্ন-প্রাশনের উৎসবের জন্য ঢোলে নূতন নূতন বোল তুলিতে প্রয়াস করিত, ঢোলের সাহচর্য্যে তার সময় আনন্দে কাটিয়া যাইত, নিসঙ্গতা সে অনুভব করিত না!

॥ ৪ ॥

তারানাথবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কাছাকাছি একদিন জোড়াদীঘির বাজারে বড় সোরগোল পড়িয়া গেল। জমিদারপক্ষ হইতে প্রথমে ব্যাপারটা চাপিয়া দিবার চেষ্টা হইল—বেসরকারী ভাবে

টাকা দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার, সংক্ষেপে ঘুষ দিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই ফল ফলিল না; ক্রমে ঘটনা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—মালেক জমিদারের পক্ষ হইতে লোক ও আদালতের পেয়াদা তারানাথবাবুর জমিদারি নীলাম করিতে আসিয়াছে।

তারানাথবাবু প্রতিপত্তিশালী লোক—সেজন্য অপর পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি করে নাই; চার-পাঁচজন নিজ পক্ষের পাইক, দুই-তিন জন চাপরাশধারী আদালতের পেয়াদা ও নিশানদার সঙ্গে ছিল। তারা বাজারের এক দোকানে ঘাঁটি গাড়িয়া একজন ঢুলীর সন্ধান করিতে লাগিল।

সকলেই জানেন যে এ সব ব্যাপারে ঢুলী ঘটনাস্থলে আসিয়া সংগ্রহ করা হয়, সঙ্গে করিয়া কেহ আনে না; আরও জানা উচিত যে অধিকাংশ সময়েই ঢুলীর উল্লেখ কাগজেপত্রেই হয়, বাস্তবে তার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে, বিশেষ যেখানে অপর পক্ষ প্রবল, পরে মামলা-মোকর্দ্দার আশঙ্কা আছে, সে-সময় ঢুলীকে বাস্তব রঙ্গমঞ্চে ডাক পড়ে; ঢুলী আসিয়া নগদ দক্ষিণা লইয়া আদালতের পেয়াদার মন্ত্র-আবৃত্তির সঙ্গে ঢোলে কয়েক ঘা দিয়া যায়।

আদালতের পেয়াদা জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে ঢুলী আছে কি না?

সকলে সমস্বরে বলিল—হাঁ! নাম তার নগেন হাড়ী—

তিনু ধোপা (সম্প্রতি সে চৌকিদার) নগেনকে ডাকিতে গেল। যে-জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য আজ সে কয়েক মাস হইল প্রস্তুত হইতেছে, তার সম্পত্তি নীলামের জন্য ঢোল বাজাইতে হইবে শুনিয়া নগেন বলিল—তাহার শরীর ভাল নাই, সে যাইতে পারিবে না।

তিনু ফিরিয়া গেলে অপর পক্ষের কর্ম্মচারী নগেনের বাড়ী আসিল। সে নগেনের সম্মুখে নগদ আড়াইটা টাকা রাখিয়া বলিল—ওহে বাপু একবার চল—বেশী কষ্ট করতে হবে না। ঐ বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার কয়েক বাজিয়ে দিলেই চলবে।

নগেন টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—যেদিন তোমার জমিদাবেব সম্পত্তি নীলাম হবে সেদিন ডেকো, বিনা-পয়সায় বাজিয়ে আসব।

অপর পক্ষের লোক রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আ মলো যা—ছোঁড়াব যে ভারি তেজ! ভালোয় ভালোয় যাবি তো চল—নইলে আদালতের পেয়াদা এসে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবে!

নগেন বলিল—যা তোর বাপকে ডেকে আন্।

অপর পক্ষের কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল—বোধ হয় তার পিতাকে আনিবার জন্যই।

ব্যাপার শুনিয়া আদালতের চাপরাশী লাল হইয়া উঠিল অর্থাৎ পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া লইল—খাকি জামার উপরে চাপরাশটা বাঁধিয়া লইল—এবং ব্রিটিশ আইনের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্যে সকলকে লইয়া নগেনের বাড়ীর দিকে চলিল।

সকলে নগেনের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল—সে উঠানে দিব্য নিশ্চিতভাবে বসিয়া একখানা সান্‌কিতে করিয়া পান্তাভাত খাইতেছে।

চাপরাশী বলিল—এই বেটা চল্ জানিস কোম্পানীর কাজ!

নগেন শান্ত ভাবে বলিল—চল যাচ্ছি। খেয়ে নি।

সকলে অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—কোম্পানীর কি মহিমা! যে-কাজ নগদ আড়াই টাকায় সম্ভব হয় নাই, তাহা পেয়াদার উপস্থিতি মাত্রেই সম্ভব হইল!

নগেন আহার শেষ করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিল—চল, কোথায় যেতে হবে।

চাপরাশী গর্জ্জন করিয়া বলিল—নে ঢোল কাঁধে নে।

নগেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলিল—ঢোল! ঢোল তো আমার নেই।

নাই! লোকটা বলে কি!—সকলে চমকিয়া উঠিল।

তিনু বলিয়া উঠিল—পেয়াদা সাহেব মিথ্যা কথা! ঢোল ছাড়া ও বাঁচবে কি ক'রে? নিশ্চয়ই ওর ঘরের মধ্যে আছে।

পেয়াদার হুকুমে দু-তিন জন তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় ঢোল আছে।

কিন্তু কোথাও ঢোল পাওয়া গেল না। পেয়াদার হুকুমে ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল—কোথাও ঢোল নাই।

অবশেষে একজন মাচার নীচে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে! পেয়েছি! সে ঢোলটা টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু একি! সবাই অবাক্ হইয়া গেল। এ যে চামড়া-কাটা, খোল-ফাটা, পালক-ছেঁড়া, কাঠ চামড়া আর পালকের একটা স্তূপ। এই কি নগেনের বহু সাধের ঢোল!

পেয়াদা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই বেটা তোর ঢোল কোথায়?

নগেন হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—উই যে! তার পরে বলিল—চল কোথায় যেতে হবে।

অপর পক্ষের লোকেরা আশাভঙ্গ হওয়াতে চটিয়া বলিল—নে, নে ভাঙা ঢোল নিয়ে আর যেতে হবে না।

নগেন শান্তভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—যে-দিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম করবার দরকার হবে, সে দিন ডেকো, ভাল ঢোল নিয়ে যাব, পয়সা দিতে হবে না।

রাগে ও অপমানে পেয়াদার লাল পাগড়িটা খসিয়া পড়িয়াছিল, সে সেটাকে বাঁধিতে বাধিতে সঙ্গীদের বলিল—চল। নগেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—নেব বেটা তোকে দেখে!

নগেন বলিল—আর ঢোল তৈরী করলে তো!

সত্যই তারপর হইতে নগেন ঢুলি হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিল!

অশরীরী

অল্প দিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়ীতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ীর একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরও আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেহ জানিত না। বাড়ীর একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিলনা, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ীর একটি চাকরের। অনেক দিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল করিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পারিত।

তিন চার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়ীতে ঘটিল। পরিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙিয়া পড়িল কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবী ছাড়ে না, সেই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবার অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে

আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে যায়, এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ অপরের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া ওঠে!

আরও একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। 'এবার কার পালা?' এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল—হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া কথাটা প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়ীটা কেমন যেন অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল! লোকে যে কথাবার্ত্তা বলিত না, কিম্বা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না—কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইত যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপরে কে যেন অদৃশ্য গদি পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠানামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন?

এই সময়ে একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্ত্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার। দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। 'কি হয়েছে রে?' সে কেবল একটি কথা বলিল, "দেও"। এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের কালো বকুল গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুল গাছটা একটা সুবৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে 'দেও' অর্থাৎ ভূতটুত কিছু নয়, হঠাৎ ওই গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে 'দেও' একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরৎ জানালার দিকে মুখ করিয়া ওই গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা 'দেও' নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন? পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায় শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা পশ্চিমা ধরণের সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল, বলিল যে, এ বাড়ীতে 'দেও' আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনের শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি

সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বেটার পালাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দু-চার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে, বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে এক শয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমূলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেহ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমূলতলায় আমাদের একটি বাড়ী ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমূলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়ীতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্ব্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমূলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়, প্রথমটা কিছুদিন সর্দ্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তারকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাসশক' বলিয়া মনে হইতেছে। 'নার্ভাস শক' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের স্নায়ু-পুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িকভাবে বিকল হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সব সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়—এ কয়মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করিব, সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে, ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারে বলিয়াছে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এ রোগের কোন ঔষধ নাই, শুইয়া থাকাই একমাত্র চিকিৎসা তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না—ইচ্ছাও বড় ছিল না।

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরণের সেকেলে বাড়ী। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি অনেকগুলি কক্ষ বাড়ীটিতে; এখন দু'তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে এক দিকে আমার শয্যা, শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথের লোক চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রি-বেলায় গ্যাসের আলোক কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূবের জানালা দিয়া হু হু করিয়া বাতাস প্রবেশ করে। আমি অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি; ক্লান্তি যতই বাড়ে—একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন বিছানার উপর গড়াইতে থাকি,—গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘুধরণের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটাই, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুল গাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি ও পাখিগুলার কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যায়।

সেদিনটার কথা, কিম্বা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত—সে রাতটার কথা কখনও কি ভুলিতে পারিব! আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনও ভাবি নাই 'তাহার' হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা 'নার্ভাস্‌ শকের' প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়।

নার্ভাস শক। ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল লোকে তাহার বেশি তার অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমিতো জানি, আমার অভিজ্ঞতায়, 'তাহার প্রভাব' কতখানি সত্য,—কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন 'নার্ভাস শক' বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি

না, চুপ করিয়া থাকি কিম্বা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে 'তাহার আবির্ভাবের' সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি—মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়াই পড়িয়াছিলাম!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম, জানালার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা, গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিলাম—লাগিতেছে। সন্দেহ মাত্র আর রহিল না যে, আমি জাগ্রত। ভয়ে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না ; ঘরেব আলো জালিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর! কালো প্রকাণ্ড মস্তক! নাক চোখ মুখগুলা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাকা আরও কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে —ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর গাড়ী পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপরে পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল। মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে ভ্রান্তি। যে বকুল গাছটাকে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক বলিয়া মনে হইল! তখনই আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল,—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়! যাই হোক গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল খাইবার জন্য উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে একবার উঠিয়া জল পান করিয়াছি? কই, মনে তো পড়ে না! চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে সুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরীটা আরও পাকা হয়! কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভালো। শরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখন হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেয়াল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি এক প্রকার ধিক্কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসের ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল! জল খাইল কে? আমিই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া জল পান করিয়াছি—এমন অসম্ভব না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প করিলাম—কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জল পান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝ রাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিম্বা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। রাতে শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইতাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে

চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল—আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম—Poe-র Mystery and Imagination-এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নীচের লাইব্রেরী ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে? আর গেলাসই বা খালি করিল কে? চাকরকে আর কি বলিব? নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোরবেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

একবার মনে হইত নির্জ্জন বাড়ীর নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোক-জনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো 'অশরীরীর' হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্ব্বল যে, অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে? কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত, পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে—কিম্বা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা করিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, কানের ভিতর হইতে সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরও একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণ শক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নীচু বা খুব উঁচুর দিক শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়ীটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্ত্তী বাড়ীগুলিতে কে কি বলিতেছে

তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমূলতলায় পত্র পাইলাম। তাহারা লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ ঘটনা আমার অগোচর নয়। আরও লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতায় মধ্যে একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল, ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন?

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ী জিম্মা রাখিয়া আমি শিমূলতলায় রওনা হইয়া গেলাম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ—ব্যাপার কি?

কেহ বলিল—শরীর অর্দ্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল—মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল—কতকাল চুল কাটো নাই।

কেহ বা বলিল—কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল—এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমূলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারীর উচ্চতম সীটে উপবিষ্ট—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোট বড় বাড়ী, বাগানে বাগানে শীতের মরসুমি ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধানকাটা হইয়া গিয়াছে, এক দিকে শীর্ণ নদী, এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম, উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বারান্দায় বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখিতাম। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্ত্তিমান চঞ্চলতার মতো রেলগাড়ী মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম।—এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দূর পাল্লার ভ্রমণে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে ষ্টোভ, চা,

চিনি, কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া যখন নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি, আমি বলিয়া উঠিলাম—ওই দেখো, দূরে মাঠের মধ্যে গোটা কয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভালো করিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বলিলাম—তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না? ওই তো স্পষ্ট!

তাহারা বলিল—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি, এখন ঠাট্টা ভালো লাগে না।

আর একজন বলিল—লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা, দেখে, তুমি যে 'গো-তৃষ্ণিকা' দেখিতে লাগিলে!

তৃতীয়জন বলিল—তুমি কি চোখে দূরবীণ লাগাইয়াছ নাকি।

আমি বলিলাম—অবিশ্বাসে কাজ কি? আমাদের তো যাইতেই হইবে—চলো ওই দিকেই যাই না!

সকলে নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিলাম—প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল!

আমার সঙ্গীদের একজন বলিল—কী আশ্চর্য। তুমি এক ক্রোশ দূর হইতে দেখিলে কিরূপে? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

আর একজন বলিল—আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে! মাঠে গরু চরবে এ আব বিচিত্র কি!

আর একজন বলিল—এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়!

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার কবিলাম যে, শ্রবণশক্তির মতো আমার দৃষ্টিব সীমাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন! ভাবিতাম অশরীরী এমন করিয়া আমার কান ও চোখের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশরীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোন কাজকর্ম ছিল না—বাড়ীর টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল-ওঠা অর্জ্জুন গাছের তলায় গিয়া

বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্দ্ধচন্দ্র ও অরণ্য রেখা দেখিতে পাইতাম। উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালাগুলা স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। আশ্চর্য্য আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়। প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখা প্রশাখা পত্রপল্লব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোন এক জাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

রাতের বেলার উপসর্গ আরও বিচিত্র; বুঝিলাম অশরীরী ক্রমেই আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপ বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্ব্বতন এক ইংরাজ গভর্ণরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। এক সময়ে সখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্ণর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম কোন বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোর বেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, একাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের দরজা তো এখনো বন্ধ। আমিই স্বপ্নে উঠিয়া একাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে, এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কাহাকেও আর বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জ্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না—মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

এই সময়ে আর একটি নূতন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার

মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল। আমার কেবলই মনে হইত এই যে, আমার চক্ষু কর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্ব্বাভাস। মৃত্যুর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরও একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত, মনে হইত একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন ?

রাত্রি বেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, বিদ্যুতের টর্চ্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ চোখে পড়িত দেয়ালের ছবিখানাকে কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ীর সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল, এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে চুণার রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়ীতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল—একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায় ? স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংসন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায় ? ভাবিলাম এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে ? হওয়াই সম্ভব আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম, লোকটা দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে ? দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছে—আর দরজায় ঘষা কাচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে ? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া

দরজায় ধাক্কা দিতে সুরু করিলাম। দরজার ভিতর ছিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণ বলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোন লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া না পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল—আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম, অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল—কি খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল। ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোন লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনই মনে হইল একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না। চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনার পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। ষ্টেশনে নামিয়া একজন ওই দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম, তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল। তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়ীতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে?

দারোয়ানজী বলিল—আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশি হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'বর্ত্তন উর্ত্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে আর 'রসুই' করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। 'লেকিন মছলি উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দারোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ী কেহ তৈয়ারী করে না। বাড়ীর ঠিক সম্মুখেই গঙ্গা—এখন বসন্তকালে বাড়ীর কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার, অপরটি শুইবার। বসিবার ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম। আজ তিন চার মাসের মধ্যে নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মতো, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম আমার হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্যবিধানের সুবিধার জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাশের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গত রাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজ কর্ম্ম সব জানে। চা, জলখাবার, ডালভাত, তরকারী, রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময় মতো করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা পাতিয়া দিত। কোন বিষয়ে আমার ভাবিবার আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া, গড়াইয়া, বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউ-গাছেঘেরা একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট একখানা খাপরার ঘরে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া

জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্ত ছোট একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জবর লড়াই হইয়াছিল; অনেক মোগল পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ুন বাদশাহি লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্ত জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ্ ও হুমায়ুনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সম্মুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার গড়—আর চারদিকে শ্মশানের ধূমের মতো ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শ্বসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে তৃতীয়ার অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ুনের গুপ্তচরের মতো এ পারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিতেছে আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জ্জনের মতো ওই ঝাউয়ের একটানা হু হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতাজোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর এক জোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি? সে বলিল—বাবুজি, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় এক জোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন।

তারপরে নিবেদন করিল আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতা-জোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম। লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম—একি! এযে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম—কি রকম লোক, আর একবার বলো তো।

সে বলিল—বাবুজি, আমি অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতা জোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি—তবে কি আমার সেই রোগ হইল! কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয়তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কি ভাবে? অজ্ঞাতসারে ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম। হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম—আর কোন সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ।

বুঝিলাম এ সেই অশরীরীর ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে, কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লাগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে, অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ

পিঠের উপরে কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জ্জন, কেহ কোথাও নাই।

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল। ভাবিলাম এ রকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল এ যাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে—ভাবিলাম মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভূঁয়ে মরিব কেন? এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া? আবার তাকাইলাম শূন্য আয়না ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌছায় না। তবে এ কী দেখিলাম! বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি কোন দুর্জ্ঞেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে, আয়নার উপরে ছায়া। শুধু এক বিদ্যুৎ ঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মতো, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মতো মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই, তবে আমার ধারণা এই যে, কোন একটা মনোভাব চরমে পৌঁছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়, মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে, মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি—অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব, আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে মরিলেই আমার মরা সার্থক

হইবে। আমি স্থির করিলাম যে, আর দুই এক রাত্রি অশরীরীর রহস্যোদ্ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলীভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম তখন কে জানিত যে সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার—দূরাগত ঝাউগাছের হু হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শ্রুত হইতেছিল ; সম্মুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলী বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ঐ এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেক দিন হাসি নাই ; এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই, নিজের হাসিতে নিজে চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া, ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নাব উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহিব করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমাব ঠিক পিছনে দেওয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস্ দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী। মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে মনে হইল, আমার ঠিক পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলিতে শিকার ও শিকারীর দুইজনেরই জীবনাবসান।

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্যঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা

ছুটিতে লাগিল। পিছন হইতে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর হাসির খন্ খন্ শব্দ আওয়াজ কানে আসিল, মনে হইল অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্কার করিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মেঝে কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার। .

* * * * *

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত, ভিখু মাথায় বাতাস করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়ানজী গম্ভীর মুখে দণ্ডায়মান। শিমূলতলার ঠিকানায় একটা তার করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম যে, আমার পরিবারের জনতিনেক কাছে বসিয়া আছে। তাহাদের বলিলাম—আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চলো।

পরদিন প্রাতে শিমূলতলায় আসিয়া পৌছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি এই রহস্যের উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তর পাইয়াছি। 'নার্ভাস শক।' মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা 'সাব্জেকটিভ রিঅ্যাকশন।' বন্ধুরা বলে আমি ধাপ্পা দিতেছি কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিকভাবে জানি সমস্তই নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম—সেই রাত্রের পিস্তলের গুলী সেই মোহভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অশরীরীর নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিক্কারের অট্টহাস্য করিয়া আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে ও তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্কারের অট্টহাস্য বলিতেছ বস্তুত তাহা পিস্তলের গুলী লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি।

স্বপ্নলব্ধ কাহিনী

লেখকজীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, লিখিবার কিছু না থাকিলেও লিখিতে হয়। শরীর খারাপ বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না, ভাবে ওটা বাড়াবাড়ি হইতেছে; সময় নাই বলিলে ভাবে ওটা চাপ দিয়া কিছু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবার অজুহাত মাত্র। কাজেই হতভাগ্য লেখককে, যুগপৎ পিছনের ঠেলায় ও সামনের টানে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। আমার লিখিবার অভ্যাস আছে, লেখার প্রেরণায় যে লিখি এমন মনে করিবার কারণ নাই, নিতান্তই আর কিছু করিতে পারি না বলিয়া লিখিয়া যাই। সেটা বিস্ময়ের নয়, বিস্ময় এই যে, এমন লেখাও সম্পাদকগণ কাঞ্চন-মূল্যে কিনিয়া ছাপিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সম্পাদকচক্রের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি, মাথাটা বিশ্রাম পায়। আমার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইবার সময় পূজার ছুটি, আকাশ যখন নির্মল হইয়া উঠে, উত্তরে বাতাসে শিউলিফুলগুলি যখন স্নেহ সম্ভাষণের মতো টুপ টুপ করিয়া ঘাসের উপর পড়িতে থাকে, আর প্রত্যেক তৃণ-পল্লবের আগায় একটি করিয়া শিশির বিন্দু দেখা দেয়, সেই নিরাময় শরৎকালে আমি কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়ি।

সেবার এই উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছি, জিনিসপত্র গাড়ীর কামরায় তোলা হইয়াছে, আমি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একটি চুরুট সবে ধরাইয়াছি—এমন সময়ে পিছন হইতে কে নাম ধরিয়া ডাকিল। ফিরিয়া দেখি—পত্রের সম্পাদক। ব্যাপার কি শুধাইবার আগেই ব্যাপারখানা কি তিনি আগেই জানাইয়া দিলেন—একটি গল্প চাই। বলিলাম, দেখছেন আমি তো বেরিয়ে পড়েছি। তদুত্তরে তিনি সন্তর্পণে কয়েকখানি নোট আমার মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বিনীতভাবে হাসিলেন, ভাবটা এই যে, এবারে তো হইল, আর কোন অজুহাত চলিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, নোট কয়খানা ফেরৎ দিবার মতো সৎসাহস আমার হইল না।

বলিলাম, কিন্তু কবে যে পাবেন স্থির নাই। সম্পাদক বলিলেন, যখন খুশী দেবেন, অর্থাৎ টাকা যখন একবার গিলিলেন তখন লেখা কি করিয়া আদায় করিয়া লইতে হয় তাহা যদি না জানি তবে সম্পাদকতা করিতেছি কেন? যাই হোক সম্পাদককে নমস্কার করিয়া বিদায় করিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সাধারণতঃ আমার নিরুদ্দেশ বাসের ঠিকানা কেহ জানিতে পায় না। তার কারণ বেড়াইতে বাহির হইবার কয়েকদিন আগে একবার অজ্ঞাতবাসের স্থান খুঁজিতে বাহির হই এবং অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় একটা লক্ষীছাড়া আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসি। এবারে চলিয়াছি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে। পুরুলিয়া হইতে টাটানগর পর্য্যন্ত ছোটনাগপুরের ভূখণ্ডে অনেকগুলি ছোটোখাটো রেল ষ্টেশন আছে। তাহাদেরই মধ্যে একটা জায়গাকে বাছিয়া লইয়াছি। জায়গাটি শুধু নির্জ্জন নয়, এ যেন সংসার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দিনের মধ্যে খানকতক উজান ভাটি রেলগাড়ী পুরাতন স্মৃতির মতো হু হু করিয়া চলিয়া যায়, সবগুলি থামে না, তারপরই সব আবার পূর্ব্ববৎ, নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, বিস্মৃত। স্টেশনটির নাম গোপন রাখিলাম, আরও একবার যাইবার ইচ্ছা আছে, সম্পাদকগণের কবলে পড়িতে চাই না।

প্রকৃত নাম গোপন করিয়া জায়গাটিকে বিরামপুর বলিয়া উল্লেখ করিব। বিরামপুরের স্টেশনমাস্টার আমাদের দেশের লোক। তিনি আমার নির্জ্জনবাসের অভ্যাস জানিতেন। এবার পূজার আগে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, একবার বিরামপুরে আসুন, ইহার চেয়ে নির্জ্জনতর স্থান আর পাইবেন না। তাঁহার আহ্বানে বিরামপুরে গিয়া স্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে একটি বড় বাড়ি স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীটি বৃহৎ, খুব পুরাতন না হইলেও পরিত্যক্ত পড়িয়া থাকায় অল্প বয়সেই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান মালিক বরাহভূমের এক ইংরাজ পাদ্রী। বাড়ীটি সে কিছুকাল আগে কিনিয়া, ছিল, কাহার কাছ হইতে জানি না। পাদ্রী সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করিবে। কিন্তু পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা বরাহভূমে স্থাপন করিয়াছে। বরাহভূম স্টেশন এই লাইনেই কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। পাদ্রী সাহেবের কাছে নামমাত্র ভাড়ায় বাড়িটি একমাসের জন্ত লইয়াছিলাম। স্টেশন

মাষ্টার বলিলেন যে, আপনি আসিলে ঠাকুর ও চাকরের একজন 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড' নিযুক্ত করিয়া দিব।

হাওড়া হইতে রওনা হইয়া পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই বিরামপুর আসিয়া পৌছিলাম। সে বেলা ষ্টেশনমাষ্টারের বাসাতেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। বিকাল বেলা একখানা গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলিয়া বাড়িটির দিকে চলিলাম। সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টার চলিলেন। তিনি 'ঝরকু' নামে একজন স্থানীয় লোককে কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে আগেই গিয়া বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বাসযোগ্য করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। মাঠ পার হইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে গিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশন ও বাড়িটির মধ্যে একটি উচ্চ ভূখণ্ড, নতুবা এক স্থান হইতে অপর স্থানটি দেখা যাইত। বাড়ির পাশে দাঁড়াইলে ষ্টেশনের সিগন্যাল বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পৌছাইতেই ঝরকু চা করিয়া আনিল। দুইজনে চা পান করিলাম। ষ্টেশনমাষ্টারবাবু প্রতিদিন একএকবার করিয়া আসিয়া খোঁজ লইয়া যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আমি ভগ্ন প্রাসাদের একক অধীশ্বর হইয়া বারান্দায় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম।

বাড়িটার সম্মুখে বাগান আছে কিম্বা ছিল বলাই উচিত এখন তাহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, দু'চারটি টগর, করবী ফুলের গাছ ছাড়া অন্য গাছ নাই। বাড়িটির চারিদিক ঘেরিয়া টানা বারান্দা—মাঝখানে বড় একটি হল, দু' কোণে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর। অদূরে পাকশালা, ভৃত্যনিবাস প্রভৃতি। কাছেই একটি ইঁদারা, ইঁদারার পাশে গোটা দুই মহুয়া ও অর্জ্জুন গাছ। বাড়িটি দেখিলে মনে হয় যে, সৌখীন লোকের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাড়িটির সুখের অবস্থা গত, এখন কোনরূপে খাড়া হইয়া আছে মাত্র। ভাবিলাম, আমি সুখের সন্ধান করিতে আসি নাই, নির্জ্জনতা আমার কাম্য, এমন অজ্ঞাতবাসের স্থান আর পাইব না।

বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিলে চোখের দৃষ্টি সুদীর্ঘ ছাড়া পথ, একেবারে বাধে গিয়া দিগন্তের গিরিমালায়। বাড়িটার সামনেই একটি রিক্তমাঠ—উঁচু হইয়া চলিয়া গিয়াছে—তার পরেই প্রথমে চোখে পড়ে সুবর্ণরেখা নদীর অপর তীর, এদিকের তীরটা মাঠের স্ফীতির আড়ালে গুপ্ত।

নদীর পরপারে জনশূন্য, তৃণশূন্য, তরুগুল্ম-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর, দিগন্তে সেই অনুর্বর, রুক্ষ পাহাড়ের প্রাচীর। এমন নেড়া পাহাড় জীবনে দেখি নাই, পাহাড় নয় যেন অতিকায় পুরীর ভগ্নপ্রাচীর, ভগ্নপ্রাচীরের যে শ্যামলতাটুকু দেখা যায় তাহারও অভাব। চারিদিকের এমন লক্ষ্মীছাড়া নির্জীব ভাব আর কোথাও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এক একবার মনে হয় যেন পরিচিত পৃথিবীর অংশ নয়, চন্দ্রলোকের মৃত জগতের একটা খণ্ড। কেবল স্বস্তি পাই আকাশের দিকে তাকাইলে—এমন স্বচ্ছ নির্মল নভঃকান্তি বাঙলার লোকে কল্পনা করিতে পারিবে না। বাঙলা দেশে পৃথিবীর শ্যামলতা আকাশের নির্মলতার প্রতিদ্বন্দ্বী—তাই শরতের আকাশও সেখানে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে না। আকাশের দিকে তাকাইয়া আমি কল্পনার ভেলা ভাসাই, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেবকন্যাগণ মেঘের ভেলা ভাসায়—দুই-ই উদ্দেশ্য-হীনভাবে নিরর্থকতার দিকে ভাসিয়া যায়।

এইভাবে দিন দুই যায়, বিকাল বেলা ষ্টেশনমাষ্টার আসেন, তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়া জনসঙ্গের স্বাদ উপভোগ করিয়া আসি। জনসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নির্জ্জনতাকে আরও বেশি করিয়া পাই। সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্ফুটমান তারাপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া বারান্দায় থাকি। ঝরকু একাধিকবার তাড়া দিলে তবে উঠিয়া আহার করিতে যাই। আহারের পরে শয়ন। ছোট কামরা-দুটির একটিতে আমার শুইবার ব্যবস্থা। আর একটিতে বসি, লিখিবার কিছু সাজসরঞ্জামও সেখানে আছে।

দুই তিন দিন পরে একদিন জামার পকেটে হাত দিতেই কতকগুলো কাগজ খচ্‌মচ্‌ করিয়া অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া দেখি—তাহারা সম্পাদকের দেওয়া সেই নোটগুলি। সেই নোটের স্মৃতিতে সম্পাদক ও সংসারের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম আর বিলম্ব না করিয়া একটা কিছু লিখিয়া পাঠাইতে হয়, নতুবা সম্পাদক হয়তো এই অজ্ঞেয় স্থানে আসিয়া পড়িবে, সম্পাদকের কিছুই অসাধ্য নয়।

লিখি লিখি করিয়াও সারাদিন লিখিতে বসিতে পারি নাই, সন্ধ্যাবেলা মনকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিব স্থির ছিল না। এক সময়ে ভাবিতে ভাবিতে লিখিতাম, এমন লিখিতে লিখিতে ভাবি, চলার বেগে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাতেই আলো জ্বলে। ভাবিলাম এই বাড়ি ও মাঠের বর্ণনা দিয়াই আরম্ভ করা যাক না কেন। সরোবরে একটি

লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা আমার কাজ, তারপরে তরঙ্গমালা নিজের নিয়মেই ছড়াইয়া পড়িবে। রচনার প্রথম ধাক্কাটা লেখকের অধীন—তারপর হইতে লেখক রচনার নিয়মাধীন হইয়া পড়ে। যাহাই হোক, এই মাঠ ও এই বাড়িটির বর্ণনার পরিবেশ রচনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলাম, এবারে গল্পের সূচনা করিবার পালা—কিন্তু গল্পের সূচনার পূর্ব্বেই নিদ্রার সূচনা হইল। গল্পের ভার আগামীকল্যের উপর রাখিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে বিছানায় গিয়া পড়িলাম। রাত্রির দ্বিগুণিত নিস্তব্ধতার প্রান্তে শিবাধ্বনির প্রহর ঘোষণার সঙ্কেতটুকুমাত্র মনে আছে—তারপরে আর কোন সম্বিৎ রহিল না।

ঘুমাইয়া একটি স্বপ্ন দেখিলাম। অবশ্য ঘুমের মধ্যে স্বপ্নবোধ হয় নাই, জাগিয়া উঠিবার পরেই স্বপ্ন বলিয়া বুঝিলাম। স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি একটি উৎসব-ভাবাপন্ন বাড়িতে গিয়া যেন ঢুকিয়াছি। চারিদিকে লোকজনের যাতায়াত, আমি সকলকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু আমাকে কেহ দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না বা দেখিতে পাইতেছে না। আমি বাহির বাড়ি হইতে বাবুদের বৈঠকখানায় গেলাম। তারপরে আরও একটা মহল অতিক্রম করিয়া একেবারে অন্দরমহলে গিয়া পৌছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে, পুরস্ত্রীগণের কেহ কেহ নিজেরা সাজিতেছে, কেহ কেহ বা গৃহসজ্জায় ব্যস্ত। তাহারাও যে আমাকে দেখিতে পাইতেছে এমন বোধ হইল না। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, এই বাড়ির একটি মেয়েকে বরপক্ষ আজ দেখিতে আসিবে। তাই উৎসবের আয়োজন বটে। এবারে বিবাহের কনেটিকে দেখিবার কৌতূহল হইল। অন্দরমহলের দোতলার টানা বারান্দা দিয়া চলিয়াছি—আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া অবাধ অধিকার। ঈষন্মুক্ত একটি জানালাপথে দেখিলাম যে, তিন চারজন মিশ্র-বয়সের মেয়েতে মিলিয়া একটি তরুণীকে সাজাইতেছে। বুঝিলাম এইটিই বিবাহের কনে। এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই, যেন ক্ষীরসমুদ্রের চাঁছি। যেমন শুভ্র, তেমনি সুকুমার। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মেয়েটির দুই চোখ হইতে জল ঝরিয়া তাহার দুই গাল ভাসিয়া যাইতেছে। একটি বর্ষীয়সী মহিলা বলিতেছে—মা ইন্দিরা, আজকার দিনে চোখের জল ফেলো না।

মেয়েটির নাম তবে ইন্দিরা।

ইহার পরেই স্বপ্নের পটপরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইন্দিরার বিবাহ সভা। বরকন্যা মুখোমুখি উপবিষ্ট। বরের চেহারা আমার ভালো লাগিল না। দেখিতে সে সুপুরুষ নয়। কিন্তু সে অভিযোগ আমার নয়। তাহার মুখে চোখে শিক্ষা-দীক্ষার ছাপের অভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ হইতে আচার-ব্যবহার সব তাতেই কেমন একটা অমার্জ্জিত রুচির আভাস। আর সবচেয়ে বেশি করিয়া নজরে পড়িল—তাহার সর্ব্বাঙ্গে, চোখে-মুখে কেমন একটা নির্লজ্জ ক্ষুধার ভাব! তাহার পাশে ইন্দিরাকে রজনীগন্ধার কুঁড়িতে রচিত একটি মূর্ত্তির মতো বোধ হইতেছিল। ইন্দিরা নিস্পন্দ, নিষ্পলক, মূর্ত্তিমতী নিষ্পাপ। মনে হইল এ রকম বি-সমের মিলন কখনই সুখের হইতে পারে না। ইহা কি পূর্ব্বাভাসে ইন্দিরা জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা সেদিন তাহার চোখে জল ঝরিয়াছিল কেন, নতুবা আজ তাহার মূর্ত্তিমতী শুভ্র অশ্রু-সমুদ্রের স্ফটিকীভূত পুত্তলির মতো বোধ হইল কেন।

আবার স্বপ্নের পটপরিবর্ত্তন হইল। আমি যেন একটি নূতন বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়িটি চেনা-চেনা মনে হইলেও ঠিক কোথায় দেখিয়াছি বুঝিতে পারিলাম না (স্বপ্নভঙ্গের পরে বুঝিয়াছি বিরামপুরের বাড়ীটাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম)। রাত্রি তখন অনেক। আমি যেন একটা কক্ষের পর্দ্দাটানা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম (পরে বুঝিয়াছি যে আমার বর্ত্তমান শয়নকক্ষটিই দেখিয়াছিলাম)। পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিলাম, ফুলশয্যার বিছানা—কেহ নাই। মনে হইল, এ উচিত হইতেছে না। ফিরিয়া যাইব কিন্তু অদৃশ্য কণ্ঠের অর্দ্ধশ্রুত স্বর কেবলি কানের কাছে বলিতে লাগিল—"ফিরিয়া যাইও না, ফিরিয়া যাইও না, সাক্ষী থাকিয়া যাও।" আমি মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট ইন্দিরাকে অনুসরণ করিয়া তাহার বর আসিতেছে। লোকটা বলিতেছে, শোবে এসো। এখনো কথা শোন। ইন্দিরা বলিতেছে, না, না, আজ থাক। বর বলিল, সে কি, আজ ফুলশয্যার রাত। ইন্দিরা তবু বলিল, কাল হবে। কাল হবে শুনিয়া লোকটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—জানো, আমি এখন তোমার মালিক; জানো, আমি যা খুশী করতে পারি।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—আমাকে তুমি চেনো না! আমি নিজের হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, আমার বন্দুকের গুলি খুব সিধা চলে।

একথায় ইন্দিরা ভয় পাইল বলিয়া মনে হইল না। সে শান্ত ভাবে বলিল—তবে তাই হোক, তোমার গুলি আর একবার সিধা চলুক, তাতেই আমার শান্তি।

ইন্দিরার উত্তরে লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া প্রস্থান করিল—বোধ হয় বন্দুক আনিতেই গেল। ইন্দিরা একটা টেবিলের উপর বাম হাতের ভর দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সপ্তমীর চাঁদের আলো জমাইয়া কঠিন করিয়া লইয়া কোন্ দিব্য-শিল্পী তাহার মূর্তি কুঁদিয়া রচনা করিয়াছে।

আবার পটপরিবর্তন হইল। এবার কেবল কালের পরিবর্তন, স্থানের নয়। আমি পূর্ব্ববৎ সেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। দেখিলাম, ফুলশয্যার একান্তে ইন্দিরা শায়িতা, নিদ্রিতা, শান্ত, শুভ্র, সুকুমার, নিস্পন্দ তাহার দেহ যেন মন্দাকিনীর খানিকটা জমিয়া তুষারে পরিণত। কিছুক্ষণ পরে তাহার বর প্রবেশ করিল—পুরুষের এমন নির্লজ্জ ক্ষুধার মূর্তি দেখি নাই। সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—তবে যে বড় বড়াই করা হয়েছিল—আমার শয্যায় শোবে না! এখন! তোমার নাকি বন্দুকের ভয় নাই?

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—ওঃ ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে! আচ্ছা কি করে ঘুম ভাঙাতে হয় তা দেখাচ্ছি!

এই বলিয়া সে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মতো শয্যার উপরে, ইন্দিরার দেহের উপরে বলাই উচিত, লাফাইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য আমার দেখা উচিত নয় বলিয়া যতই সরিতে যাই, সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর আমাকে বলে তুমি যাইও না, তুমি যাইও না, সাক্ষী থাকিবার জন্য তোমাকে আনিয়াছি।

লোকটা লাফাইয়া পড়িয়াই পর মুহূর্ত্তে বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—এ কি। এ কি! এ কি হ'ল!

সে একবার ইন্দিরার মুখে, নাকে, বুকে হাত দিয়া অনুভব করিল, কোথাও কোন স্পন্দন নাই, আশার কম্পমাত্র নাই। সে ত্রাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিলাম, সত্যই বিষম। ইন্দিরার একখানা বাহু সে নিজের কণ্ঠে জড়াইয়া লইয়াছিল, সে বাহুপাশ হইতে লোকটা আর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না—

বরং মনে হইল, তরুণীর বাহুলতা লৌহবলয়ের মত তাহার কণ্ঠ ক্রমশঃ আঁটিয়া ধরিতেছে। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখ-চোখ ক্রমে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার দম বন্ধ হইবার মতো হইয়াছে, তাহার আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে স্বর বন্ধ হইবার মতো হইল। এমন সময়ে দপ্‌ করিয়া ঘরে আলো নিভিয়া গেল। আমার স্বপ্ন মিলাইল।

দুপুর বেলা আহারান্তে আমার অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পের কাছে গিয়া বসিলাম। খাতাখানা পূর্ব্ববৎ ছিল। কিন্তু পাতা উল্টাইতেই বিস্মিত হইলাম! এ কি! এতগুলা পাতা লেখা হইল কি প্রকারে? আমি তো মাত্র চারখানা পাতা লিখিয়াছিলাম। পাতা গুনিয়া দেখিলাম আরও ছাব্বিশ পাতা কে লিখিয়াছে? কিন্তু লিখিল কে? হাতের লেখা তো আমারই দেখিতেছি। কিছু বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়াই দেখি না কি লিখিল। খানিকটা পড়িয়াই ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম! এ যে আমার স্বপ্নে-দেখা কাহিনী। গত রাত্রে যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যে-ভাবে দেখিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই লিখিত। আরও আশ্চর্য্যের এই যে হস্তাক্ষর আমারই। আর ভাষার যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহাও আমারই। তখন প্রত্যয় হইল—আর কিছু নয়, আমিই স্বপ্নের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া গল্পটা লিখিয়া ফেলিয়াছি। যদিচ এমন অভ্যাস আমার ছিল না, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার নজিরের অভাব নাই। তখন অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলাম, ভাবিলাম মাঝে মাঝে এমন ঘটিলে মন্দ হয় না। সম্পাদকের একটা দেনা শোধ হইবার পন্থা হয়। গল্পটা পড়িয়া মন্দ লাগিল না। স্থির করিলাম—কালকের ডাকে সম্পাদককে পাঠাইয়া দিব।

বিকালবেলা স্টেশনমাষ্টারবাবু আসিলেন। তিনি বলিলেন, চলুন আজ সুবর্ণরেখার দিকে যাওয়া যাক।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, ও দিকে একেবারে যাওয়া হয় নি।

বাড়ীর সামনে একটা মাঠ। মাঠটা উঁচু বলিয়াই নদীর তীর দেখা যায় না। মাঠ পার হইতেই সুবর্ণরেখা চোখে পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

স্টেশনমাষ্টারবাবু বলিলেন—এদিকে আসুন, একটা জিনিষ দেখাই।

উঁচু তীর হইতে নীচে নামিতেই পাশাপাশি দুটো অদ্ভুত স্তম্ভ চোখে

পড়িল। কাছে গিয়া স্তম্ভের গাত্রে সংলগ্ন শ্বেত পাথরে খোদিত লিপি দেখিয়াই আমি চমকিয়া উঠিলাম!

স্টেশনমাষ্টার শুধাইলেন,—চমকালেন কেন?

চমকাইনি, হুঁচোট খেয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল। শ্বেত-পাথরের কালো অক্ষরগুলা ধূর্জটির প্রথমকুলের মতো চোখের উপরে নাচিতে লাগিল। অনেক কষ্টে মন সংযত করিয়া আবার পড়িলাম—একটি স্তম্ভে লিখিত—"ইন্দিরা রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ, ফুলশয্যার রাত্রি।" তাহার পাশের স্তম্ভটিতে লিখিত—"ফণীন্দ্র রায়, মৃত্যু ২৮শে অগ্রহায়ণ ফুলশয্যার রাত্রি।"

আমি বসিয়া পড়িলাম। আমার স্বপ্নে লেখার থিওরী ধ্বসিয়া পড়িয়া মনটা আবার অভাবিত সমস্যার সম্মুখে গিয়া পড়িল!

স্টেশনমাষ্টারবাবু আমাকে বসিতে দেখিয়া বসিলেন, বলিলেন—ফুলশয্যার রাত্রে বরবধূর একত্র মৃত্যু দেখে বিস্মিত হয়েছেন নিশ্চয়?

আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—হাঁ।

তবে শুনুন—বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—যে বাড়ীটায় আপনি আছেন, সেখানেই এই ব্যাপার ঘটেছিল অনেকদিন আগে। এখানকার পুরাণো লোকদের মুখে এ কাহিনী শুনেছি। আরও শুনেছি যে, এ বাড়ীটা ফণীন্দ্র রায়েরই ছিল। তার মৃত্যুর পরে সেই পাদ্রীসাহেব কিনে নিয়েছে।

—মৃত্যুর কারণ কিছু শুনেছেন?

তিনি বলিলেন, অনেকে অনেক কথা বলে—কেউ বলে, নূতন বৌয়ের গহনার লোভে ডাকাতে এসে মেরে গহনাপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। আবার কেউ বা বলে—ফণীন্দ্র রায় নিজেই বধূকে হত্যা ক'রে শেষে আত্মহত্যা করেছে! মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র নাকি ভালো ছিল না!

শেষোক্ত মন্তব্য শুনিয়া অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—না, না, তা হ'তে পারে না।

স্টেশনমাষ্টারবাবু শুধাইলেন—কেন, আপনি কিছু শুনেছেন কি?

—ওটা এমনি বললাম।

তিনি বলিলেন—তা বটে, আপনিই বা শুনবেন কোথা থেকে? এসব অনেককাল আগেকার কথা।

তারপরে বলিলেন—চলুন ফেরা যাক। এখানে অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুক বের হয়।

দু'জনে ফিরিয়া চলিলাম। তিনি ইন্দিরার কাহিনী বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য তুচ্ছ কথা লইয়া পড়িলেন—কিন্তু সেদিকে আমার মন ছিল না। আমার মনের মধ্যে ইন্দিরার স্মৃতি একটি অলৌকিক শ্বেত ময়ূরীর মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া ক্রমশঃ অন্য সব বিষয় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে লাগিল। মনে হইল ইন্দিরাই আমাকে তাহার ট্রাজেডির সাক্ষী হইবার জন্য করুণ আহ্বান জানাইয়াছিল, আমি সরিতে চাহিলেও সরিতে দেয় নাই। তাহার মৃত্যুর সত্যটা আর একটা মানুষকে জানাইবার জন্যই এতকাল তাহার আত্মা যেন আকুলিবিকুলি করিতেছিল। এতদিন পরে হয়তো ইন্দিরা শান্তি পাইল। যখন বাসায় ফিরিলাম, শরতের নৈশ আকাশ ইন্দিরার অশ্রুজলে ছাইয়া গিয়াছে। কত অশ্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, ইন্দিরার অশ্রু মুছিবার নয়, তারকাপুঞ্জের অমর ভাস্বরতায় চিরকাল তাহা জ্বলিতে থাকিবে।

কপালকুণ্ডলার দেশে

বিচিত্র কর্মপ্রবাহ আমাকে কপালকুণ্ডলার দেশে টানিয়া আনিয়াছে। নবকুমারের মতো আমি রসুলপুরের নদীর মোহানা বাহিয়া আসি নাই বটে, তবে রসুলপুরের নদীর মোহনার ধারেই আসিয়া পড়িয়াছি। কয়েকশত বৎসর আগে এই অঞ্চলকে নবকুমার যেমন দেখিয়াছিল বা আশি বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেখিয়াছিলেন, আমিও তেমনি দেখিলাম। কপালকুণ্ডলার দেশে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আরও ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে একটা বালিয়াড়ির শিখরে চড়িলাম। অদূরে রসুলপুরের নদীটা দুই তটবাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এই নদী সমুদ্রের আলিঙ্গনে, কোথায় নদীর শেষ, আর কোথায় নদীর আরম্ভ বুঝিতে পারা যায় না। পারা গেলে কি মিলন অসম্পূর্ণ থাকিত না? যে-মিলনে দুইয়ের সীমা ঘুচিয়া না যায় সে তো জোড়া লাগামাত্র, মিলন নয়। এতদূর হইতে সমুদ্রের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তার বেশী নয়। একটা কূলে আমি দাঁড়াইয়া আছি—আর একটা কূল নাই, কেবল সীমাহীন প্রসার—অভ্যস্ত চোখ না হইলে তাহাকে আকাশ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে না। দূরে, ঐ সীমাহীনের মাঝখানে একটা জায়গায় একটা রেখা মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। ওই বোধহয় তরঙ্গমালা। দূরত্ব এমন অপরিমিত যে তরঙ্গমালার গতি বুঝিবার উপায় নাই—মনে হয় তরঙ্গরেখা একই স্থানে কুঞ্চিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। চোখ দুটার দৃষ্টিকে পীড়ন করিয়া সমুদ্রে ইউরোপীয় জাতির অর্ণবপোত আবিষ্কারের চেষ্টা করিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নাঃ, নবকুমারের সময়ের পরে অনেক যুগ চলিয়া গিয়াছে—অর্ণবপোত এখন স্বল্পজলে আসিবে না। নদীর কূল হইতে আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি—অনেকটা জায়গা, কিন্তু না আছে সেখানে ধানের ক্ষেত বা ক্ষেতের চিহ্ন, আবার না আছে বড় গাছগাছড়া, কেবল ইতস্তত: ছোট-খাটো ঝোপঝাড়।

বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বর্ষাকালে সমস্তটা ভরিয়া যায়, গুল্মগুলি ডুবিয়া নষ্ট হয়, জল সরিয়া গেলে আবার জন্মায়। ওদের জীবন ষান্মাসিক। আমি একটি বালিয়াড়ির চূড়ায় দাঁড়াইয়া আছি—আমার বামে বালিয়াড়ির উচু নীচু শৃঙ্খল অনাস্তস্ত প্রবাহে চলিয়াছে—শুনিতে পাই সুবর্ণরেখা অবধি এমনি চলিয়াছে। আমি যেটির উপরে আছি সেটা এই গিরিশৃঙ্খলের শেষ চূড়া—তার পরেই নদী উপত্যকার সমতল মাঠ। ১৯৪২-এর প্রবল বন্যা ও ঝড়ে বালিয়াড়ির উচ্চতা অনেকটা নাকি হ্রাস পাইয়াছে, আবার অনেকগুলি একেবারেই নাকি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আমার পিছনে, বালিয়াড়ির নীচেই উদ্ভিদ্ জগতের সীমানা। গাছের মধ্যে প্রধান এক রকম বন্য বাদাম আর ঝাউ গাছ। বোধ করি নবকুমার ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় এই বুনো ফলগুলিও খাইয়াছিল। নবকুমারের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বুনো বাদাম পাড়িয়া আনিলাম। ফলগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কলিকাতার সৌখিন কফি হাউসে ভর্জিত আকারে লোকেরা এগুলি খায়। কিন্তু আবার আমার দুর্ভাগ্য। এখনো পাকে নাই। নবকুমার পৌষের শেষে খাইয়াছিল—এখন চৈত্র মাস। পাকিতে আরও কিছু বিলম্ব। বুঝিলাম পাকা লেখকের হাতে পড়িলে ফল অকালে পাকিয়া ওঠে।

ঝাউয়ের শাখায় অবিরল হাহাকার চলিতেছে। এখানে সমুদ্রের আর কিছু না থাক সমুদ্রের হাওয়াটি আছে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই তালে তালে দমকে দমকে তার গতি—ঝাউয়ের শাখা করুণায় শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে। ওই সমুদ্র যেন গৃহহারা কোন্ গুণী—মানব জগতের প্রান্তে মাটির উপরে দেহ এলাইয়া দিয়া ঝাউএর বাঁশীটি অধরে তুলিয়া লইয়াছে। অনাদি ব্যথার অনন্ত সুর ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ঝাউয়ের হাহাকার এমন করিয়া মন উদাস করিয়া দেয় কেন? তার কারণ আর কিছুই নয়—ঝাউগাছ যেখানেই হোক তার আদি জন্মভূমি সমুদ্রতীরের স্মৃতি ভুলিতে পারে না। সমুদ্রতীরের স্মৃতিতে তার মনে আদিকালের বিরহ ব্যথা ধ্বনিত হইয়া ওঠে। সেই বিরহ শ্রোতার মনে চৈতন্যপূর্ব বেদনা জাগ্রত করিয়া দেয়—সে হাহাকার করিয়া ওঠে, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারে না। তাই তার এমন উদ্ভ্রান্তি।

সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে। আকাশ এখনো সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আচ্ছন্ন,

কেমন যেন ঘোলাটে, কেবল পশ্চিমের সূর্য্যাস্তের শ্রান্তটা রক্তাক্ত। বাতাস শীতল হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতির মুক্তপথের উপরে কে যেন কোমল তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার আগেই ফিরিতে হইবে, নতুবা নবকুমারের আশঙ্কা অপ্রত্যাশিত ভাবে সফল হইয়া "শিয়ালের" আবির্ভাব হইতে কতক্ষণ। এই বাঘের রাজ্যে নবকুমার শিয়ালের হাতে না পড়িয়া কপালকুণ্ডলার হাতে পড়িয়াছিল—আমার যেমন কপাল আমার ভাগ্যে শৃগালোদয় ঘটিয়া যাইবে। আবার কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও বিচিত্র নয়। কাজেই মোটরখানার কাছে অনিচ্ছাসত্বেও ফিরিয়া গেলাম এবং গাড়ীতে উঠিয়া চাবি টিপিলাম। গাড়ীখানা বার দুই গোঁ গোঁ শব্দ করিল—কিন্তু চলিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। তখন গাড়ী হইতে নামিয়া হাতল ঘুরাইতে আরম্ভ করিলাম। হাতল ঘুরিল, হাত ব্যথা হইল—কিন্তু গাড়ী কিছুতেই চলিল না। সর্ব্বনাশ! গাড়ীটা কিছুক্ষণ ঠেলিতে পারিলে চলিতে পারে—কিন্তু লোক কোথায়? মাঠের মধ্যে কোথায় জন-প্রাণী নাই। এখন? এ যে সত্য সত্যই নবকুমারের দশার সূচনা। এদিকে অন্ধকারের প্রথম পর্দ্দাখানা মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম এখন গাড়ীর চিন্তা রাখিয়া বাড়ীর চিন্তা করিবার সময়। নিকটে কোথাও লোকালয় থাকিলে সেখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে—গাড়ী এখানেই পড়িয়া থাক। "শিয়ালে" গাড়ীর আর কি করিবে? লোকালয়ের সন্ধানের বাহির হইলাম। বালির উচ্চ একটা শিরদাঁড়ার উপর দিয়া পথ—একটা বালিয়াড়ির অংশ—বোধহয় কোন প্রাচীন কালে একটা নদীস্রোত ভূমিকম্পের ঠেলায় উঁচু হইয়া শুকাইয়া গিয়াছিল—এখন তার চিহ্নরূপে শুষ্ক বালির নিশানা পড়িয়া আছে। বালুকাময় পথের একদিকে বাদাম, ঝাউ আর আম কাঠালের বন—আর এক দিকে ধূ ধূ মাঠ—সমুদ্রের প্রান্তে গিয়া মিশিয়াছে।

চলিতে লাগিলাম—পথ উঁচু নীচু, নির্জ্জন, মাথার উপরে ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস, চারিদিকে হাওয়ার হাহাকার—অন্ধকার ক্রমে ঘনতর হইতেছে। এমন সময়ে একটা বালিয়াড়ির আড়াল হইতে আলুলায়িতকুন্তলা, হরিণনয়না কোন তরুণীর মূর্ত্তি যদি জাগিয়া ওঠে, আর সে বারেক আমার দিকে তাকাইয়া যদি বলিয়া ওঠে, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু নাঃ, এসব কাণ্ড কেবল কাব্যে উপন্যাসেই ঘটে। আমি তো

সমুদ্রতটে বালিয়াড়িতে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইলাম‌না। কেহ কখনো শিবমন্দিরে তিলোত্তমার দর্শন পাইয়াছে কি? তবে সংসারে কৎলুখাঁ ও বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রচুর। তাহাদের সাক্ষাৎ বাঞ্ছা না করিলেও ঘটিয়া যায়। সর্ব্বনাশ। যদি কাপালিকটাই দেখা দেয়। দ্রুততর চলিতে লাগিলাম। আচ্ছা, আমি না হয় কল্পনা-লেশহীন নিরেট গদ্য, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন এখানে আসিয়াছিলেন তাহার চর্ম্ম-চক্ষুতেও কপালকুণ্ডলা তো পড়ে নাই। তবে তিনি নাকি কাপালিকের দেখা পাইয়াছিলেন। একটা রাত্রি নাকি তাঁহাকে এই অঞ্চলেই কাটাইতে হইয়াছিল। তাহারই প্রত্যক্ষ ফল নাকি কপালকুণ্ডলা কাব্য।

হাতে একটা টর্চ্চ বাতি ছিল, এখন সেটা ঘন ঘন টিপিয়া পথ চলিতে হইতেছে। একবার টর্চ্চের বিদ্যুত আলোয় পথের বাঁদিকে একটা উঁচু ভিটার মত চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম—একটা চারচালা ঘরই বটে। কিন্তু ঘরটা তাহার চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। চারিদিক ঘুরিয়া বুঝিলাম—এক কালে গৃহটি সুনির্ম্মিত ছিল। মেঝে এখনো পাকা, তবে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকায় ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। দরজা জানলা খসিয়া পড়ার মতো—কাছেই আর দুটি ভিটা—সেখানে ভূতপূর্ব্ব ঘরের চিহ্ন মাত্রও নাই। ভাবিলাম এই নির্জ্জনে ঘরগুলি আসিল কোথা হইতে? ভাবে মনে হইল—ডাকবাংলা জাতীয় কোন আশ্রয় হইবে। খুব সম্ভব বিয়াল্লিশের বন্যায় এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে। তারপরে মেরামতের কথা আর কাহারো মনে পড়ে নাই।

ঘরটির ভিতরে ঢুকিলাম। একখানা জীর্ণ খাটের কঙ্কাল ছাড়া আর কোন আসবাব নাই। ভাবিলাম এখানেই রাতটা কাটাইয়া দেওয়া যাক। চোর ডাকাত আসিবে না, তাহারা যতই চতুর হোক এখানে জনাগম কল্পনা করিতে পারিবে না। আর "শিয়াল!" দরজার দিকে তাকাইলাম। কোনরূপে ভেজান চলে মাত্র—অর্গল বলিয়া কিছুই নাই। শিয়াল কখনো ঘরে ঢুকিয়া লোক ধরে না বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। কাজেই দরজা ভেজাইয়া দিয়া শূন্য চৌকির উপর শুইয়া পড়িলাম। একটু নড়িলেই খাটের কঙ্কাল মড় মড় করিয়া আপত্তি জানায়। ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। একবার মনে হইল—হয়তো এই ঘরটিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেককাল পূর্ব্বে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। মনে মনে হাসি

পাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সাহিত্যসিংহাসনে বসিবার সুযোগ পাইল না—কিন্তু তাঁহার শূন্য খট্টার আজ আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী অন্ততঃ একটি রাত্রির জন্য। আর কেহ তাহাতে ভাগ বসাইতে আসিবে না আশা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, খাটখানা মড় মড় শব্দ করিয়া উঠিল। অপরিচিত স্থানে সুনিদ্রা হয় না। ঘুম ভাঙিয়া প্রথমে ঠাহর হইল না কোথায় আছি। বিদ্যুতের বাতি টিপিয়া চারিদিক দেখিয়া সম্যক্ অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তাই তো! জনশূন্য মাঠের মধ্যে ভাঙা একখানা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। দরজা ভেজাইয়া দিয়াছিলাম, খুলিয়া গিয়াছে। যে বাতাস! বাতাস যেন ঝড়ের বেগ ও গর্জ্জন পাইয়াছে—ঝাউয়ের শাখায় শাখায় কি পাগলামি চলিতেছে! আর বাতাসের উত্তাল উন্মত্ততার পটভূমিতে আরও একটা দূরশ্রুত চাপা হুঙ্কারের মতো কি যেন ধ্বনি! দিনের বেলায় তো শুনি নাই। একটু স্থির হইয়া ভাবিতেই মনে হইল—খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের গর্জ্জন। ঠিক, তাহা ছাড়া আর কি হইবে? শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। পশ্চিম দিগন্তে ম্লান চন্দ্র অস্ত যাইবার আয়োজন করিতেছে। সেই আবছায়া আলো-অন্ধকারে সমস্ত দৃশ্যপট কালি-ঢালিয়া পড়া একখানা ছবির মতো অস্পষ্ট। বাতাসের গর্জ্জন, ঝাউয়ের শাখার মাতামাতি, দূরশ্রুত সেই বিরামহীন ভৈরবধ্বনি। সমস্ত প্রকৃতি যেন এক ভৈরবীচক্রে অবাঞ্ছিতের মতো উপস্থিত। অননুভূত-পূর্ব্ব একভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে কি ভয়? ভয়ের মূলে এক নির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা থাকে—কিন্তু এই নূতন অনুভূতির মূলে তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট ভাব নাই। জনপদবাসী মানুষ জনপদের বাহিরে আসিয়া পড়িলে বোধ করি এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। ঘড়িতে মাত্র বারোটা। জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার আসিয়া শুইলাম। বার-দুই এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ যেন মনে হইল কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! চোর ডাকাত নাকি? এখানে আসিতে যাইবে কেন? ভাবিলাম একবার লোকটার চেহারা দেখিতে পাইলে হইত, কিন্তু উঠিতে সাহস করিলাম না, নিদ্রিতের মতো পড়িয়া রহিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া একটুখানি আবছা

আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। অস্তমান চাঁদের আলো নাকি? কিন্তু চাঁদটা নিশ্চয় ডুবিয়া গিয়াছে। আমিতো অনেকটা সময় ঘুমাইয়াছি। লোকটা ঘরের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে! একবার সে দরজার অবকাশ ও আমার দৃষ্টির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। না দেখিয়া পারিলাম না—কিন্তু না দেখিলেই বুঝি ভালো ছিল। দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, দৃঢ়-শরীর, মাথায় জটা! আবার সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। পাশ ফিরিলে দেখা যায় কিন্তু নড়িতে সাহস হইল না! কিন্তু ভূত না মানুষ? যেই হোক এখানে কেন? কি খুঁজিতেছে? ভূত বা মানুষ যে-ই হোক আমাকে তো দেখিতে পাইবার কথা! ও কি দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করিতেছে না? কিম্বা সবই হয়তো মিথ্যা—আমি তো স্বপ্ন দেখিতেছি না? চোখে হাত দিয়া দেখিলাম চোখ-খোলা, চিমটি কাটিয়া দেখিলাম বেদনা বোধ হইতেছে। তবে লোকটা বাস্তব। কিন্তু ও কে? এবং এখানে কেন? শুধাইব? সর্ব্বনাশ! নড়িবার সাহস অবধি নাই।

এবারে লোকটা বৃথা সন্ধান ছাড়িয়া দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং কথা বলিল—আমি সে কথা শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম বলিতেছি কিন্তু সে যেন কানে শোনা নয়; তাহার কথাগুলি যেন উপলব্ধি হইতে লাগিল। লোকটা বলিতেছিল—নাঃ লোকটাকে কি বলিলাম আর কি লিখিল! আমি বলিলাম আমার সাধনামার্গের গূঢ় রহস্য—লিখিয়া বসিল একটা গল্প!

এবারে বুঝিলাম হয় আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নয় লোকটা ভূত। কারণ একমাত্র স্বপ্নের কথাই কানে না শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায়—আর কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম—যে সাধারণতঃ মানুষ যেমন ভূতকে দেখিতে পায় না, ভূতের পক্ষেও মানুষ তেমনি অদৃশ্য। তবে মানুষ ও ভূতের ইচ্ছায় ইচ্ছায় ঠোকাঠুকি হইয়া গেলে তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পায়—মানুষ ও ভূতের জ্ঞানের মাধ্যম ইন্দ্রিয় নয়, ইচ্ছাশক্তি।

আবার যেন শুনিতে লাগিলাম—আমি ভাবিয়াছিলাম লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল। কত লোককেই তো বুঝাইয়াছি—কিন্তু তাহার মতো কেহ বুঝিতে পারে নাই। বলিয়াছিল, লিখিবে। আমি বলিলাম—লিখিও, তুমি পারিবে, আর এসব গূঢ় কথা সকলকে জানাইবার প্রয়োজন আছে। ভাবিলাম একবার সেই ঘরটাতে খুঁজিয়া দেখি—যদি পাণ্ডুলিপিখানা পাই, দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

থামিল। এবারে সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না; বঙ্কিম, তুমি যে কি সুযোগ নষ্ট করিলে তাহা তুমি জানোনা!

এতক্ষণে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি—কপালকুণ্ডলার কাপালিকের স্বপ্ন। আমার বঙ্কিমপ্রীতি আর কপালকুণ্ডলার দেশ, তার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে এই ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস, সবশুদ্ধ জড়াইয়া দিয়া একটা দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। ততক্ষণে লোকটা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর দেখিতে পাইলাম—হাঁ, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মতো চেহারাটা! গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং হাতে প্রকাণ্ড একখানা চিমটা। লোকটা হন্‌হন্‌ করিয়া নামিয়া অগ্নিশিখার দিকে চলিতে লাগিল। তাই বটে,—অদূরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহারই আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এবারে বিশ্বাস পাকা হইল যে এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—এবারে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা অনেকটা হইয়াছে। লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। প্রথমেই স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল। ভাবিলাম এমন স্বপ্নও মানুষে দেখে! আবার ভাবিলাম স্বপ্নই যদি দেখিতে হয় তবে স্বপ্নদর্শনের এমন দেশ কাল পাত্র আর কোথায় পাইব? বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—অগ্নিকুণ্ডের চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না। ভাবিলাম স্বপ্নের আবার চিহ্ন কি?

পায়ের জুতা জোড়ার ফিতা বাঁধিবার জন্য মুখ নীচু করিবার সময় চমকিয়া উঠিলাম—এ কি! বারান্দায় এ কাহার পদচিহ্ন? আমার হইতেই পারে না, আমার পায়ে সর্ব্বদা জুতা ছিল। এ খালি পায়ের চিহ্ন, তাহা ছাড়া এত বড় পা আমার নয়! কাদাবালুমাখা মস্ত একখানা পায়ের ছাপ! স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের দেহায়তনের অনুপাতিক ছাপ। তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইবার উদ্দেশ্যে ভিতরে টিপবাতি আনিতে গেলাম—মেঝেতে আর একটি ছাপ! তবে তো স্বপ্ন নয়! স্বপ্নমূর্ত্তির কি ছাপ পড়ে? নিশ্চয়ই ঘরে কেহ ঢুকিয়াছিল। কে সে? কেন ঢুকিয়াছিল? আমাকে দেখিতে পায় নাই? না, দেখিয়াও গ্রাহ্য করে নাই? কিন্তু সে যে স্বপ্নমাত্র নয় সে কথা নিশ্চিত! আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার সাহস

হইল না। বারান্দা হইতে নামিয়া পথের দিকে দ্রুত যাত্রা করিলাম—পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সাহসটুকুও হইল না।

কিছুদূর যাইতেই একটি লোককে দেখিতে পাইলাম—তাহাকে আমার মোটর বিগড়ানোর সংবাদ জানাইয়া বলিলাম যে একটু সাহায্য করিতে হইবে। সে রাজি হইয়া শুধাইল—কিন্তু কাল সারা রাত্রি ছিলেন কোথায়?

আমি বলিলাম—কেন ওই ভাঙা ঘরটায়!

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—ঘর? এখানে ঘর আসিল কোথা হইতে?

—কেন ওই যে! বলিয়া আমি ফিরিয়াই ইঙ্গিত করিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। ঘর কোথায়? একখানা শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে মাত্র।

লোকটা কি ভাবিল জানি না। হয়তো ভাবিল আমি তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, হয়তো ভাবিল আমি মাতাল। আরো কত কি ভাবিল কে জানে? অধিক ভাবিবার সময় না দিয়া তাহাকে লইয়া মোটরখানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার ভাবনার অবসান ঘটিল না। আজিও ঘটে নাই। কি দেখিলাম? কোথায় ছিলাম? এ সমস্যার সমাধান আজিও খুঁজিয়া পাই নাই।

গঙ্গার ইলিশ

পণ্ডিতেরা বলেন কাজই নাকি মানবজীবনের লক্ষ্য। হয় তো তাই। কিন্তু এ সব অকাজের কথা ভাবিবার অবসরটুকু অন্তত পণ্ডিতদের আছে। আমার তাও নাই। আমার কর্মতালিকা দেখিলে পণ্ডিতদেরও স্বীকার করিতে হইত—কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে।

সকালে পাড়ায় দুটি ছেলে পড়াই। ছাত্র দুটির পিতা সত্যই পুত্রের শুভানুধ্যায়ী—পাঠের সময়ে তাঁরা কাছেই বসিয়া থাকেন—একটাও বাজে কথা বলিবার সময় পাই না। একজনের মাছ কিনিয়া দিবার ভার আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত পিতা মৃদু হাসিয়া বলেন, মাস্টার মশায়, একবার বাজার থেকে···ওরে রামা সঙ্গে যা। আচ্ছা আপনি এগোন—রামা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য রামা যায় না—আমি একাই যাই এবং মাছ কিনিয়া আনি।

চাকরের হাতে মাছ কিনিবার ভার দিলে চুরির আশঙ্কা; আমাকে দিয়া সে ভয় নাই, হাজার হোক নোব্‌ল প্রফেশানের লোক তো! বাঙালি পিতাদের প্রাইভেট্‌ টিউটারদের উপরে অগাধ বিশ্বাস।

আহারান্তে সাড়ে দশটায় আসল কর্মস্থলে যাই। আমি 'জুট-মিল বিদ্যাকেন্দ্রের' অধ্যাপক। দশটা হইতে ছাত্ররা আসিতে থাকে; এগারটার মধ্যে বাড়ি ভরিয়া যায়; আড়াই হাজার গাঁঠ ছাত্র-সংখ্যা আমাদের। বছরে বছরে দেড় হাজার গাঁঠ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিই; সেখানে ভালমন্দ মাঝারি দর কষা হইয়া থাকে। আমাদের কাজকে প্রায় নিষ্কাম বলা যাইতে পারে; বেতন এতই অকিঞ্চিৎকর, মাসের প্রথম দিনের পরে হাতে আর কিছু থাকে না। তবে নোব্‌ল প্রফেশানের লোক বলিয়া দোকানে বাকি পাওয়া যায়। হায় হায়, লোক ঠকাইবার মরাল কারেজও আমাদের নাই—এ কথা সবাই জানিয়া ফেলিয়াছে। 'জুট-বিদ্যাকেন্দ্রের' মালিক সুবিধাজনক

পোষমানা একটা মৃগী ব্যারাম অর্জ্জন করিয়াছেন, বেতন বৃদ্ধির কথা তুলিতেই তিনি মূর্চ্ছা যান।

সন্ধ্যাবেলাতেও ছুটি নাই, রাত্রে 'জুট মিলে' বাণিজ্য শিক্ষা দিই। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি বাণিজ্য শিক্ষার উপযুক্ত সময় বটে। রাত্রি ন'টায় ছুটি। কলিকাতা শহরে নিতান্তই চৌকিদারি প্রথা নাই—নতুবা রাত্রিটা চৌকিদারি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। কাজের জন্যই যখন মানুষের জন্ম তখন আর এটুকু ফাঁক থাকে কেন?

সেদিন রাত্রি ন'টার সময়ে 'জুট মিল' হইতে বাহির হইতেছি, সহকর্ম্মী বলিলেন, চলুন বৈঠকখানা বাজার থেকে মাছ নিয়ে যাওয়া যাক্। তার পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, রাত্রে ইলিশ মাছ শস্তা হয়।

আমি বলিলাম—চলুন।

মনে মনে ভাবিলাম, পরের জন্যই তো মাছ কিনিয়া আসিতেছি, নিজের জন্য তো কিনিবার কখনো অবসর হয় না।

সহকর্ম্মী বাজারে ঢুকিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম তিনি মাঝে মাঝে আসেন। ঝুড়ির মধ্যে স্নিগ্ধ চিক্কণ গঙ্গার ইলিশগুলি চক্রাকারে সজ্জিত, ছোট, বড়, মাঝারি, কোনটা বা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা, কোনটা বা চতুর্থীর, কোনটা পঞ্চমীর, কোনটা ষষ্ঠীর।

সের, নয় সিকে। সহকর্ম্মী বলিলেন, কাল যে দেড় টাকা ছিল। ওহে গণেশ—

গণেশ মৎস্য-বিক্রেতা। সে যেন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অন্য একজন খদ্দের আসিতেই তার প্রতি মনোনিবেশ করিল। সহকর্ম্মী আগামীকল্যের আশায় রহিলেন—আমার এই প্রথম (এবং শেষও বটে) তাই এক সেরের একটা মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে একটা কাগজের থলে ছিল—মাছটা তা'তে ভরিলাম। কেবল শুভ্র পুচ্ছটি বৃদ্ধের পাকা গোঁফের মতো বাহির হইয়া রহিল।

সহকর্ম্মী বলিলেন, আপনি এগোন। বুঝিলাম, গণেশ ও তাঁহার মধ্যে এখন ধৈর্য্য পরীক্ষার দড়ি-টানাটানি চলিতে থাকিবে।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকখানা গাড়িতেই সূচীভেদ্য ভিড়। সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া রবার্ট ব্রুসের কীর্ত্তিকে খর্ব্ব করিয়া অষ্টম ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। ভিড়ের জন্য সরলভাবে

দাঁড়ানো সম্ভব হয় নাই ; দেহখানা তিন-চার দফা বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু হাতে সেই থামখানা ঠিক আছে—তার ফাঁক দিয়া মৎস্য-পুচ্ছ দৃশ্যমান।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তারপরে যা ঘটিয়া গেল একটি মুহূর্তের মধ্যে। একজন পুছিল—কোথায় কিনলেন মাছটা ?

—আজ্ঞে বৈঠকখানা বাজারে।

তিনজন সমস্বরে পুছিল—কত নিলে ?

নোব্‌ল প্রফেশানের লোকেরা চেষ্টা করিলেও মিথ্যা কথা মুখে টানিয়া আনিতে পারে না। কিন্তু কে যেন আমার মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিল—

—আজ্ঞে পাঁচসিকে।

ট্রামের সেই সূচীভেদ্য জনতা ঐক্যতানে চিৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচসিকে !

ট্রামখানা ঘুরিয়া যেমনি শিয়ালদ স্টেশনের মুখে থামিয়াছে, অমনি সেই জনতা মুহূর্ত মধ্যে একজনবৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল—এবং পরক্ষণেই 'বিশেষ ধরণের লরি' অগ্রাহ্য করিয়া বৈঠকখানা বাজারের মুখে ছুটিয়া চলিল। কে বলিল বাঙালির মধ্যে একতার অভাব ? তবে তেমন তেমন উপলক্ষ তো চাই।

ট্রাম খালি হইয়া গেল। নিতান্ত কর্তব্যবোধে না বাধিলে বোধ করি কনডাক্টার ও ড্রাইভারও যাইত। আরামে বসিয়া পড়িলাম। বাঙালির মৎস্যপ্রীতি ও যুদ্ধের বাজার সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, কেবল ভয় ছিল হতাশ জনতা দ্রুততর বেগে ফিরিয়া আসিবার আগে ট্রামখানা এ অঞ্চল ছাড়িয়া গেলে হয়। ব্যাপারখানা হাস্যকর, মনে মনে একটু হাসিলামও বটে। কিন্তু তখনও কি জানিতাম এই মৎস্যক্রয় মাৎস্যন্যায়ে পরিণত হইবে !

নির্বিঘ্নে বাসায় পৌঁছিলাম। গৃহিণীর হাতে মাছটি দিলাম।

—কত নিলে ?

—পাঁচসিকে।

বারংবার আবৃত্তির ফলে মিথ্যাও নাকি সত্য হইয়া ওঠে—

—পাঁচসিকে !

গৃহিণীর মুখে এই প্রথম আমার বুদ্ধির প্রতি প্রশংসার আভা দেখিলাম।

তারপরে আমাকে ছাড়িয়া মাছটি লইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে মাছটি ছাড়িয়া চাকরকে লইয়া পড়িলেন।

—হাঁ হরি, তুমি মাছ কিনতে গেলে তিন টাকা সের লাগে—আর দেখ তো বাবু কেমন পাঁচসিকের মাছ কিনে এনেছে।

হরি কি যেন বলিতে গেল কিন্তু গৃহিণীর ব্লিৎসক্রিগের সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে হরিকে আর দেখা গেল না। হরি খদ্দর পরে, মেদিনীপুরের লোক, তার আত্মসম্মান কিছু উগ্র। সে যে চৌরাপবাদে পলাইবে—কিছু বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। খবরের কাগজ খুলিতেই চোখে পড়িল, বৈঠকখানার বাজারে দাঙ্গা। মৎস্য-ক্রেতা ও জেলেদের মধ্যে মাছের দর লইয়া ছোটখাটো এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ আমার সেই মৎস্য-লোলুপ জনতার কীর্ত্তি।

বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইব, এমন সময়ে গৃহিণী আমার হাতে পাঁচসিকে পয়সা দিয়া বলিলেন—আসবার সময়ে কালকের মতো একটা মাছ নিয়ে এসো।

কি সর্ব্বনাশ! এ জন্য তো প্রস্তুত ছিলাম না। বলিলাম—আজ 'জুট মিল' ছুটি। রবিবার যে।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাজার তো ছুটি নয়। ও বেলা আবার বাজার হয়নি, চাকর পালিয়েছে।

তারপরে আরো তিন দফা পাঁচসিকে হাতে দিয়া বলিলেন—ওই তিন বাড়ির গিন্নীরা দিয়েছে—তাদের জন্যেও তিনটা।

পাড়াতে তিনটি বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার গৃহিণী দুপুর বেলা সে সব বাড়িতে গিয়া স্বামীর অসাধারণ সাফল্যের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আসিবার সময়ে সুলভ মূল্য লইয়া আসিয়াছেন।

অগত্যা গৃহিণীর স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চারদফা পাঁচসিকে পয়সা লইয়া যাত্রা করিলাম। বাজারে পৌঁছিয়া ভাবিলাম যা করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ।

সিদ্ধিদাতা গণেশই বটে। পূর্ব্বোক্ত গণেশ তখন দুই ঘটি সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পার্শ্ববর্ত্তীর হাতে এক ঘটি দিতেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই চিনিল। মোহন প্রফেশানের লোক দেখিলেই চেনা যায়।

—কত করে হে?

—আজ্ঞে তিন টাকা।

—সে কি হে?

—আজ মাছের আমদানী কম।

মাছেরাও সুযোগ বুঝিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে। চারিটি মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিলাম। জুতা কিনিবার জন্য একখানা দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম—সেখানা ঘাটতির পথে গঙ্গার ইলিশের পিছনে গঙ্গা জলে গিয়া পড়িল। সবটা গঙ্গা জলে পড়িলেও সান্ত্বনা ছিল—অধিকাংশই সিদ্ধিদাতা গণেশের ফাঁকে আটকাইয়া রহিল।

নিজের ও পরের গৃহিণীরা আমার বিস্ময়কর চাতুর্য্যে খুশী হইলেন।

পরদিন শুনিলাম তাঁদের চাকর তিনটিও পলাতক। সকলেই মেদিনীপুরের লোক—খদ্দর পরে।

তারপর হইতে এখন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে ঘাটতি দিয়া গঙ্গার ইলিশ আমদানি করিয়া গৃহিণীদের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছি। কিন্তু এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে? 'জুট মিল' হইতে বেতনের মধ্যে কিছু অগ্রিম লইয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষ। এখন কি করিব?

সত্য কথা বলিব কি? না মাছ খাওয়া ছাড়িব? না, মাছ কন্‌ট্রোল হইয়াছে বলিব? কন্‌ট্রোল হইলেই যে দামে বাড়ে—একথা গৃহিণীরাও জানেন।

সত্য বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না—বিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে। মাছ খাওয়া ছাড়িলেও সকলকে তো ছাড়াইতে পারিব না, কাজেই ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। কন্‌ট্রোল? ওকথা চলিবে না—গৃহিণীরা নিয়মিত কাগজ পড়া উপলক্ষে ঘুমাইয়া থাকেন।

মিথ্যা বলাতে যে এমন ক্ষতি তাহা জানিলে কে না সত্য বলিবে!

ইলিশ মাছের সময়টা গেলেও বাঁচা যায়, কিন্তু তার অনেক আগেই যে আমার তিন মাসের অগ্রিম বেতনও যাইবে!

কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময়ে পূজা সংখ্যার লেখার জন্য তাগিদ আসিল! লক্ষ্মীর টানাটানিতে যে সরস্বতী এমন সাহায্যার্থ আসিতে পারেন, শাস্ত্রকারেরা কি তা ভাবিতে পারিয়াছিলেন? স্থির করিলাম দেশের উপকারের জন্য ঘটনাটা লিখিয়া ফেলি না কেন? ঘাটতি কিয়দংশ

যদি উঠিয়া আসে নিজের উপকারও হইতে পারে। নিজের ও পাড়ার গৃহিণীরা অবশ্যই পড়িবেন—চাই কি আমার প্রতি দয়া হইলেও হইতে পারে।

নাঃ সে ভরসা বড় নাই। একবার রসিক বলিয়া খ্যাতি রটিয়া গেলে তার দুঃখে আর কেহ বিশ্বাস করে না—না 'জুট মিল বিভাকেন্দ্রে', না বাড়িতে।

কীটাণুতত্ত্ব

আমি একবার স্বর্গে গিয়াছিলাম। পাঠক, তুমি হাসিতেছ! ভাবিতেছ, স্বর্গ পর্য্যন্ত না হোক আবগারির দোকান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। তোমার যাহা খুশী ভাবিতে পার, আমি আজ সকালবেলা সত্য কথা বলিব—বদ্ধপরিকর হইয়া বসিয়াছি।

আমি সত্যই স্বর্গে গিয়াছিলাম—ব্যক্তিগত সুখের আশায় নয়, নিতান্ত পরার্থপরভাবে। আমি পাড়ার ফ্রী থিঙ্কার ক্লাবের সেক্রেটারি। ক্লাবে ফ্রী থিঙ্কিং করিতে গিয়া দেখিলাম বাধা অনেক। কোন্ শুভকার্য্যে না বাধা থাকে! ক্লাবের সভ্যেরা বলিল, সেক্রেটারিকে একবার স্বর্গে ডেপুটেশনে পাঠানো হোক। তাহাতেও যদি কোন প্রতিকার না হয়, তবে আমরা স্বর্গের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিব। ফলে আমাকে স্বর্গে যাইতে হইল।

বলা বাহুল্য স্বর্গের পথ আমাদের পরিচিত নয়। (আধুনিককালের কারই বা পরিচিত!) অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া স্বর্গে গিয়া পৌঁছিলাম। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিলাম, ফ্রী থিঙ্কার ক্লাব হইতে। মূর্খ সে খবর রাখে না। পুনরায় শুধাইল, যেখান হইতে খুশী আস, সঙ্গে কিছু আনিয়াছ কি? বুঝিলাম, লোকটা ঘুস চাহে। প্লেটোর বাণীর যথার্থতা বুঝিলাম—পৃথিবী স্বর্গের অনুরূপেই সৃষ্ট বটে! তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দরবার-ঘরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা গেল না। পাশে একজন ব্যক্তি অনেক খাতা-পত্র লইয়া বসিয়া আছে—আদালতে জজের পাশে যেমন পেশকার থাকে, অনেকটা সেই রকম।

প্রহরী বলিয়া দিল, উনি বিধাতাপুরুষ, ইনি চিত্রগুপ্ত—তাঁহার পেশকার। তোমার যাহা পেশ করিবার থাকে এখানে কর।

আমি পৃথিবীর নানারূপ অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতির উল্লেখ করিলাম এবং ফ্রী থিঙ্কিং-এ যে কত বিঘ্ন, তাহাও বলিতে ছাড়িলাম না।

বিধাতা শুধাইলেন, ওসব পরে শুনিব, আগে বল কোথা হইতে আসিতেছ?

আমি বলিলাম, আমি পৃথিবী হইতে আসিতেছি।

তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, সেটা আবার কি?

আমি বিস্মিত হইলাম! এ আবার কেমন বিধাতা যে, পৃথিবীর খোঁজ রাখেন না! ভাবিলাম, তাই বটে, বিধাতা পৃথিবীর খবর রাখেন না বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনাচার!

বিধাতা শুধাইলেন, পৃথিবী কোথায়?

জ্যোতিষশাস্ত্র পড়া ছিল, বলিলাম, সৌরমণ্ডলের মধ্যেকার একটি গ্রহ।

তিনি আবার শুধাইলেন, সৌরমণ্ডল কি?

বিধাতা বলে কি?

সম্প্রতি জীন্সের বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছি, বলিলাম, ছায়াপথ যাহার মেরুদণ্ড, সেই বিশ্বের একটি নক্ষত্র সূর্য্য, আর পৃথিবী তারই অন্তর্গত একটি গ্রহ।

অবিচলিত বিধাতা বলিলেন, কোন্ ছায়াপথের কথা বলিতেছ? এমন পাঁচ শ কোটি ছায়াপথ আছে!

তবে কি জীন্স সাহেব ফাঁকি দিয়া গেল? না লোকটা কিছু জানে না? অমন মূর্খটাকে সবাই মিলিয়া সভাপতি করিল কেন?

ভাবিলাম, দূর ছাই! জীনসের ভরসা ছাড়িয়া নিজেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।

বলিলাম, পৃথিবীর কথা জানেন না? আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী। পাঁচটি মহাদেশ ও সাতটি সাগরে ভূষিত। তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে এই বিজ্ঞানের যুগেও বহুদিন লাগে।

কিন্তু বিধাতার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না।

আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম, পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে অন্তত দশ-বারোটি সভ্যতার উত্থান ও বিলয় হইয়াছে, এখন শ্বেতাঙ্গদের সভ্যতার যুগ। পৃথিবীতে হোমার, সিজার, শেক্সপীয়র, নেপোলিয়ান হইতে দিলীপকুমার পর্য্যন্ত মহামনীষীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই পৃথিবী পার্থিব ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের মতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এমন স্থানের সন্ধান যে আপনি জানেন না, তাহা বিশ্বাস হইতেছে না।

বিধাতাপুরুষ বলিলেন, সত্যই আমি পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জানি না, এমন কি ওই নামে যে একটা স্থান আছে, তাহাও জানি না।

'তবে কি বিনা বিচারে ফিরিয়া যাইব?'—আমার মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল।

ইহাতে বিধাতাপুরুষের যেন দয়া হইল। তিনি চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন, একবার নথিপত্র ঘাঁটিয়া দেখ দেখি, কোথাও এই পৃথিবীর উল্লেখ পাও কি না।

আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, চিত্রগুপ্ত নথিপত্র ঘাঁটিতে লাগিল।

প্রায় এক বছর পরে দরবার-ঘরে পুনরায় আমার ডাক পড়িল। দেখিলাম, চিত্রগুপ্ত বিধাতাকে বলিতেছে, প্রভু, স্বর্গের দপ্তরখানা যে কত বড়, তাহা আপনার জানা আছে। আমি পাঁচ শ সহকারী লইয়া এই এক বছর তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও পৃথিবীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। আমার বিশ্বাস, লোকটা আমাদের ঠকাইতে আসিয়াছে।

বিধাতা বলিলেন, কিন্তু আসিল কোথা হইতে, তাহারও তো একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।

তখন আমি নিজের কথা প্রমাণ করিবার জন্য ভূতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন নানারূপ উল্লেখ করিতে লাগিলাম।

অবশেষে বিধাতার যেন কি একটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, ঠিক ঠিক, মনে পড়িয়াছে—আমার শিক্ষানবিসি আমলে অনেক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহার কোনটা মনঃপূত হয় নাই বলিয়া অর্ধসমাপ্তভাবে রাখিয়া দিতাম। লোকটা হয়তো তাহারই কোনটার কথা বলিতেছে। চিত্রগুপ্ত, একবার বাতিল জগতের নথিগুলো দেখ তো।

আবার এক বছর গেল। তাহার পরে চিত্রগুপ্ত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, প্রভু, বাতিল জগতের নথিও এত যে, দেখিতে এক বছর লাগিল। একখানা অতি জীর্ণ নথির পাদটীকায় যেন সৌরমণ্ডলের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবী খুব সম্ভব তাহারই অন্তর্গত কোন গ্রহ।

বিধাতা বলিলেন, ঠিক হইয়াছে। সেই বাতিল মৃৎকণিকায় কালক্রমে জলহাওয়া লাগিয়া এক প্রকার কীটাণুর উৎপত্তি হইয়াছে, আগন্তুক তাহাকেই মানুষ বলিতেছে।

আমরা কীটাণু! জলহাওয়ায় মৃৎপিণ্ড পচিয়া আমাদের উদ্ভব! আমরা বাতিল জগতের জীব!—বিস্ময়ে, ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে মুখ দিয়া পরমপার্থিব একটিমাত্র শব্দ বাহির হইয়া আসিল, শালা।

বিধাতা বলিলেন, ওহে বাপু, কোন্ বাতিল মৃৎ-কণিকায় প্রকৃতির নিয়ম

অনুসারে কোন্ কীটাণুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ আমার নাই। বিশেষ, কীটাণুর আবার আইনকানুন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, ফ্রী থিঙ্কিং কি ? বেশি দিন তোমাদের এইসব সহ্য করিতে হইবে না। আমার বর্ণনা অনুসারে পাঁচ দিন হইল তোমাদের উদ্ভব হইয়াছে, আর দিন-চারপাঁচের মধ্যেই বিলয় হইবে। তোমাদের যাহা খুশী কর। ইতিমধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মূল্যবান্ সময় আমার নষ্ট হইয়াছে।

আমি তখন ফ্রী থিঙ্কার ক্লাবের সেক্রেটারির যোগ্য গম্ভীরতা ও মর্যাদা সহকারে বলিতে লাগিলাম, বিধাতাপুরুষ, এ তোমার অবিচার। আমি ফিরিয়া গিয়া তোমার নামে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিব। আমরা কীটাণু নই, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে—

এইখানে বিধাতা বাধা দিয়া শুধাইলেন যে, দর্শনশাস্ত্র কাহাকে বলে ?

আমি বলিলাম, যে শাস্ত্রে ভগবান ও পরকালের তত্ত্ব আছে।

কীটাণুর আবার ভগবান ! কীটাণুর আবার পরকাল !

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে যাহারা অমর—

'অমর' অর্থ কি ?

যাঁহাদের খ্যাতি চিরকাল থাকিবে।

তোমাদের চিরকাল মানে—আমার দিন-চারপাঁচ।

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, আমি সত্য বলিতেছি যে—

বিধাতা বাধা দিয়া বলিলেন, তার আগে 'সত্য' কাহাকে বলে, বল।

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে সত্য বলে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিধাতা ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না। কীটাণু তোমরা, তাহা জানিবে কি প্রকারে ?

আবার সেই অবজ্ঞার হাসি।

আমি ক্রোধে বলিলাম, এই কি ন্যায় হইল ?

বিধাতা শুধাইলেন, 'ন্যায়' কাহাকে বলে ?

আমি বলিলাম, নিজের প্রতি যে ভাব পোষণ করি, পরের প্রতি তাহার আরোপকে ন্যায় বলে।

কীটাণুর আবার আপন পর।

আবার সেই অবজ্ঞার হাসি।

আমাকে বিব্রত দেখিয়া বিধাতা বলিলেন, দেখ বাপু, তোমার ঘরের কোণে যদি একখণ্ড সন্দেশ বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া থাকে, আর কালক্রমে যদি তাহাতে কীটাণুর উদ্ভব হয়, তাহাদের সুখ-দুঃখ ন্যায়-অন্যায় লইয়া কি তুমি মাথা ঘামাও? না, তাহারা তোমার কাছে বিচার চাহিতে আসে? না, আসিলেই তুমি বিচার করিতে বসিয়া যাও?

এই মৃৎকণিকা, যাহাকে তুমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করিলে, তাহা ঐরূপ একটা বাতিল মৃৎকণিকা। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম আমলে হাত পাকাইবার জন্য ঐরূপ অনেক মাটি লইয়া আমি সৃষ্টির খসড়া করিতাম আর সন্তুষ্ট না হইলে ফেলিয়া রাখিতাম। সেইরূপ এক মৃৎপিণ্ড জলহাওয়ায় পচিয়া কীটাণুর সৃষ্টি হইয়াছে, তোমরা সেই কীটাণু। আমি ওখানে সৃষ্টির ইচ্ছা করি নাই, কাজেই আমার বিধান ওখানে নাই। ও সৃষ্টি জলহাওয়ার ফলে হইয়াছে, কাজেই প্রকৃতির নিয়ম ওখানে চলিতেছে। আবার প্রকৃতির নিয়মেই দুই চার দিনেই সব নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা মর, বাঁচ, চিন্তা কর, কাব্য লেখ, বক্তৃতা দাও, ইতিহাস সৃষ্টি কর, কম্রেড হও, ডিক্টেটার হও, যা খুশী কর। নিজেদের সুখ-দুঃখকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবিও না, যাহা লইয়া স্বর্গে আসিয়া দরবার করিতে পার। তোমরা এমনই তুচ্ছ পদার্থ যে, তোমাদের উল্লেখ পর্য্যন্ত স্বর্গের নথিপত্রে নাই।

ইহা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন, প্রভু, জীবটার স্পর্দ্ধা অসীম। উহাদের মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিন।

বিধাতা বলিলেন, তাহা হইলেও উহাদের অস্তিত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। বিশেষ, আমার বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিতে এমন বিচিত্রতর জীব যে ছিল, ইহা জানাতেই আমার লাভ।

আমি ইহাদের কাছে কোন আশা নাই দেখিয়া ফ্রী থিঙ্কার ক্লাবের সেক্রেটারির উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম, আমার আর কোন গৌরব যদি না থাকে, তবে অন্তত এই গৌরব আছে যে আমরা নগণ্য কীটাণু হইয়াও এই বিরাট বিশ্ব-বিধানের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে সাহস করিয়াছি।

আবার সেই হাসি। কিন্তু আমি যেন কল্পনার কর্ণে ফ্রী থিঙ্কার ক্লাবের সভ্যদের হাততালি ও 'হিয়ার' 'হিয়ার' শুনিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পক্ষ

দেখ, ওঠ, ওঠ—নূতন বধূ নীলিমা শেষরাত্রে স্বামীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া দিল। অন্নদাপ্রসাদ ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, শুধাইল—কি হয়েছে নীলি?

নীলিমা বলিল—আমার কেমন ভয় করছে।

অন্নদা সান্ত্বনার ও জিজ্ঞাসার সুর মিশাইয়া বলিল—ভয় কিসের?

—বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কি বল তো?

বধূ বলিতে লাগিল—যেন কে আমার শিয়রের কাছে বসে ছিল; ঘুম ভেঙে গেল; আবার ঘুমলাম—আবার তাকে দেখলাম, লালশাড়ী-পরা, গায়ে ফুলের গহনা, যেন সে-ও এক নূতন বউ!

অন্নদা পরিহাস করিয়া বলিল—ওঃ তাহলে নিজেকেই দেখেছ?

বধূ বলিল—না, তার মুখে যেন কত দুঃখের চিহ্ন, এমন বিষন্ন চোখ আমি দেখিনি।

এক মুহূর্তের জন্য অন্নদাপ্রসাদের মুখ কালো হইয়া গেল, কিন্তু প্রদীপের স্তিমিত আলোকে তাহা নীলিমার চোখে পড়িল না। স্বামী বলিল—কিছু ভয় নেই লক্ষীটি, আমি আছি, ঘুমোও।

ভীত নীলিমা স্বামীর বুকের কাছে আশ্রয় লইয়া শুইয়া পড়িল।

দিনের বেলায় এ-বিষয়ে আর কেহ কোন কথা তুলিল না; বাড়িতে নূতন গোটা দুই চাকর ছাড়া তৃতীয় আত্মীয়-স্বজন কেহ না থাকাতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে কাহাকেও বলিবার সুযোগ নীলিমার ছিল না।

কিন্তু রাত্রিতে আবার নীলিমা জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল—ওগো শুনছ, ওঠ, ওঠ।

—আবার কি হ'ল? অন্নদাপ্রসাদ জাগিয়া উঠিল।

—সেই স্বপ্ন আবার দেখেছি।

—কি বল দেখি। অন্নদাপ্রসাদ আগের রাতের ঘটনা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বধূ বলিল—লাল শাড়ী আর ফুলের গহনা-পরা কে একজন যেন আমার শিয়রের কাছে—

নীলিমার মুখের অর্ধসমাপ্ত বাক্যকে পূরণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ বলিল—চুপ ক'রে বসে ছিল। এই তো—তা থাকুক না।

নীলিমা বলিল—না, আজ সে কথা ব'লেছে।

—কথা? অন্নদা চমকিয়া উঠিল।—কি কথা?

—সে বলছিল আমাকে ঠেলা মেরে, তোর জায়গায় যা, এখানে কেন?

অন্নদাপ্রসাদ এবারে সত্যই চমকিয়া উঠিল। এমন সময়ে ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পরের কাছে সরিয়া আসিল; আর সেই শীতের রাত্রেও দু-জনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল—অন্ধকার বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না।

স্বামী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—ও কিছু না। অমন হ'য়ে থাকে।

—কেন হয় বল না?

অন্নদা আর কিছু বলিবার পাইল না, তাই বলিল—আচ্ছা কাল বুঝিয়ে দেব। সে শুইয়া পড়িল—বধূ তাহার কোল ঘেঁসিয়া শুইল।

প্রবীণ পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে নীলিমা অন্নদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পক্ষের বধূ। প্রথম পক্ষের বধূ শ্রীলেখা তিন বছর ঘর করিবার পরে কয়েক মাস আগে মারা গিয়াছে। অন্নদার পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না করিবারও কোন কারণ ছিল না, তাহার বয়স সবে সাতাশ, সন্তানাদি নাই, প্রচুর টাকা-কড়ি আছে। শেষে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে নীলিমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ অনুমান করিতে পারে নাই যে অন্নদার দ্বিতীয় পক্ষ; কেমন করিয়া পারিবে! সাতাশ বছর বয়স বিবাহের পক্ষে বেশি নয়—আজকালকার বিচারে কিছু কমও হইতে পারে। কথা যখন উঠিল না, অন্নদাও চাপিয়া গেল; শুধু তাই নয়, পাছে দ্বিতীয় পক্ষ জানিয়া নীলিমা ব্যথা পায়, তাই সে বিবাহের পরে দেশে না ফিরিয়া পশ্চিমের এক শহরে চলিয়া গেল; আর শ্রীলেখার চিহ্ন যতদূর সম্ভব মুছিয়া ফেলিল, চিঠিপত্রগুলি ছিঁড়িল, ফোটোগুলি পুড়াইল, তাহার ব্যবহৃত শাড়ী

জামা গরিবদের বিলাইয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল কখন হয়ত কথায় কথায় নীলিমাকে শ্রীলেখার কথা বলিবে—কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহা আর সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

সেদিন দুপুরবেলা অন্নদা রোদে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল আর নীলিমা প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড়-চোপড় রোদে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। নীলিমা কতকগুলি শাড়ী ও ব্লাউজ বাহির করিতে করিতে বলিল—দেখ, অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু বিয়ের আগেই এতগুলো শাড়ী কিনতে গেলে কেন?

অন্নদা হাসিয়া বলিল—কবে যুদ্ধ বেধে যায়—তখন তো আবাব চড়া দামে কিনতে হ'ত!

—কিন্তু ব্লাউজ যে এতগুলো করিয়ে রেখেছ বোকার মতো, যদি আমার গায়ে ছোট হ'ত, কি বড় হ'ত!

অন্নদা পুনরায় হাসিব চেষ্টা করিয়া বলিল—কিন্তু ছোটও হয়নি, বড়ও হয়নি, ঠিকই হ'য়েছে তো!

—তা হ'য়েছে বটে! নীলিমা ভাঁজ খুলিয়া একে একে বস্ত্রাদি রোদে দিতে লাগিল!

না হইবারই কথা। শ্রীলেখা আর নীলিমা দুজনে প্রায় এক মাপেরই। এ সমস্তই শ্রীলেখার, তবে তাহাতে ব্যবহারের কোন চিহ্ন নাই বলিয়া, আর দামও অনেক, অন্নদা সেগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

নীলিমা কৌতূহল ও আবদারের স্বরে শুধাইল—আচ্ছা কি ক'রে তুমি আমার ঠিক মাপটি জানলে?

অন্নদা বলিয়া ফেলিল—তা জান না? বিয়ের আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম—

কিন্তু কথাটা হঠাৎ-দেখা সাপের মতো দুজনকেই চমকাইয়া দিল, স্বামী অস্বস্তি বোধ করিল, বধূর রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সে বলিল—আচ্ছা এই যে আমি রাতের পর রাত ঐ একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, এর কোন প্রতিকার করবে না?

অন্নদা বলিল—স্বপ্নের আর প্রতিকার কি? আর তোমার কিছু ক্ষতিও তো হচ্ছে না।

নীলিমা বলিল—আমার কি মনে হয় জান—অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল—মনে হয় এ বাড়িতে কোন প্রেত বাস করে; সে চায় না আমি এখানে থাকি, তাই ক্রমাগত বলে, এখানে কেন? তোর জায়গায় যা! তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আচ্ছা বাসাটা বদলালে হয় না!

অন্নদা কথাটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল—আচ্ছা দেখা যাবে।

॥ ২ ॥

অবস্থা ক্রমে অধিকতর সঙ্কটজনক হইতে লাগিল। নীলিমার ঘুমাইবার উপায় আর রহিল না। একটু ঘুম আসিয়াছে কি, অমনি সে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—ওগো, শুনছ, আবার সেই মূর্ত্তি! অন্নদা কতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে? অল্পক্ষণ পরেই সে ঘুমাইয়া পড়ে—নীলিমা স্থির করে, সে আর ঘুমাইবে না, বাকী রাতটুকু জাগিয়া কাটাইবে;—কিন্তু ক্রমে জাগরণও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

নির্জ্জন ঘর, নিঃসঙ্গ প্রহর; স্তিমিত দীপের আলোয় দেয়ালে কিম্ভূত সব ছায়া পড়ে, চোখ বন্ধ করিলে সেই শাড়ী-পরা মেয়েটাকে মনে পড়িয়া যায়, চোখ খুলিয়া থাকিলে দেয়ালেব চটা-ওঠা রেখাগুলা ক্রমে রক্তে মাংসে পুরিয়া সজীব হইয়া উঠিতে থাকে!

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ওটা তো ছায়া! কিন্তু নড়িতেছে কেন? না, নড়িবে কেন? কি আশ্চর্য্য, এমন ভাবে দেয়ালের চটা উঠিয়াছে, ঠিক একটা মেয়ে-মানুষের চেহারা সৃষ্টি করিয়াছে! শাড়ীটা যেন লাল!

নড়িতেছে নাকি! স্বপ্নে-দেখা সেই মানুষ!

নীলিমা চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরে—অন্নদাপ্রসাদ লাফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি, আবার স্বপ্ন দেখলে নাকি?

নীলিমা বলে—আমি তো ঘুমোইনি।

—তবে?

—সে যেন এসেছিল।

—কে?

নীলিমা ভয়ে ভয়ে বলে, পাছে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা, সে শুনতে পায়—স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটা।

এমন সময়ে হয়ত প্রদীপটা নিবিয়া যায়, দুইজনে অন্ধকারে বসিয়া ঘামিতে থাকে। নীলিমা বলে—চল বাসা বদলাই। অন্নদা শুষ্ক কণ্ঠে বলে—আচ্ছা।

॥ ৩ ॥

অবশেষে বাসা বদলানোই স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া মনের মতো একটা বাসা মিলিল, আগামী কাল সেখানে উঠিয়া যাওয়া হইবে। নীলিমার মন অনেক হাল্কা হইয়া গেল, বহুদিন পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল। সারা দিন সে খাটিয়া জিনিষপত্র. গুছাইল, বাঁধা-ছাঁদা করিল, কাল সকাল বেলাতেই যাহাতে বাসা ছাড়িতে কোন অসুবিধা না হয় তাহার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিল—এমন কি অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা আসন্ন শয্যার কথা মনে পড়িয়া যে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, সে-ভাবটাও কমিয়া গেল; বিছানায় শুইতেই তাহার ঘুম আসিল। অন্নদা তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

আজ শেষ রাত্রি। নীলিমা স্বপ্ন দেখিল, সেই মেয়েটি লাল শাড়ীতে ফুলের গহনায় সাজিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

নীলিমা বলিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

সেই মেয়েটি বলিল—বাসা ছাড়িলেই কি আমাকে ছাড়িতে পারিবে?

—নয় কেন?

—আমার জায়গা যে অধিকার করিয়া বসিয়াছ!

নীলিমা শুধাইল—তোমার জায়গা! সে আবার কি?

মেয়েটি বলিল—যদি জানতে চাও, ওঠ।

স্বপ্ন-চালিত নীলিমা উঠিল।

সেই মেয়েটি বলিল—বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে চল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো বাহিরে আসিল, শুধাইল—কোথায় যাইতে হইবে?

—আমার পিছনে পিছনে এসো।

তাহাকে অনুসরণ করিয়া নীলিমা চলিল। সে ঘর ত্যাগ করিল;

আর একটা ঘরও ছাড়িয়া আসিল; তারপরের ঘরে মেয়েটি থামিল—নীলিমা থামিল।

মেয়েটি বলিল—ওই টেবিলের ছোট দেরাজে একটা চাবি আছে, খোলো।

নীলিমা দেরাজ খুলিয়া চাবি লইল। এখন এই ঘরটাতে তাহাদের তোরঙ্গ, বাক্স প্রভৃতি থাকিত।

মেয়েটি বলিল—ঐ হাতবাক্সটা খোলো।

নীলিমা বলিল—ও হাতবাক্স আমার স্বামীর, আমি কখনও খুলি না।

মেয়েটি বলিল—যদি সব জানতে চাও তবে খোল।

নীলিমা যন্ত্রের মতো খুলিয়া ফেলিল।

—ঐ ডালাখানা তোল।

নীলিমা তাহাই করিল।

—এইবারে ঐ কাগজগুলা সরাও।

নীলিমা সরাইল।

—ঐ দেখ একখানা বড় খাম। ওখানা বাহির করিয়া লও।

নীলিমা বাহির করিল।

—এবার বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখ।

নীলিমা সেইরূপ করিল।

তখন মেয়েটি বলিল—এইবারে দেখ খামখানার ভিতরে কি আছে।

নীলিমা একখানা পুরু কাগজ বাহির করিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিল—ও খানাতে কি আছে দেখ।

এইখানে নীলিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল তাহার হাতে একখানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী সেই স্বপ্নে-দেখা মেয়েটির ফোটোগ্রাফ। এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে মেঝের উপরে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে অন্নদাপ্রসাদের ঘুম ভাঙিয়া গেল; দেখিল পাশে নীলিমা নাই। নানারূপ শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। কোথায় গেল সে? নাম ধরিয়া ডাকিল—কেহ উত্তর দিল না। তখন মনে হইল—এই মাত্র একটা শব্দ শুনিল—কিসের শব্দ? সে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল বাক্স রাখিবার ঘরের মেঝেতে নীলিমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া

আছে। অন্নদাপ্রসাদের মুখে কথা বাহির হইল না। কিন্তু এমন করিয়া থাকিলে তো চলিবে না। সে জল আনিয়া তাহার মাথায় দিল—পাখা লইয়া বাতাস করিল, নাম ধরিয়া ডাকিল; অনেক চেষ্টার পরে নীলিমার মূর্চ্ছা ভাঙিল, জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধাইল—তুমি কে?

অন্নদা বলিল—আমি অন্নদা।

নীলিমা শুধু বলিল—ও।

অন্নদা শুধাইল—তুমি এখানে এলে কি করে?

সে বলিল—সেই মেয়েটি নিয়ে এসেছে।

—কোন্ মেয়েটি?

—সেই যাকে স্বপ্নে দেখেছি।

অন্নদা বলিল—ও সব বাজে! তুমি স্বপ্ন দেখে এখানে চলে এসেছ!

নীলিমা দৃঢ়ভাবে বলিল—স্বপ্ন নয়! তারপরে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করিল—ছবিখানা কোথায়?

অন্নদা বলিল—ছবি! কিসের ছবি?

নীলিমা বলিল—সেই মেয়েটির—সেই এক মুখ, এক সাজ!

সে এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে দেখিতে পাইল অদূরে ছবিখানা পড়িয়া আছে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার সময়ে হাত হইতে ছিটকাইয়া গিয়াছিল। সে ছবিখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—এই মেয়েটিকেই আমি প্রতিরাত্রে স্বপ্নে দেখি। আজ সে আমাকে বলেছিল, এ বাসা ছাড়লেই আমাকে ছাড়তে পারবে না। তখন সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে তোমার হাতবাক্স থেকে এই ছবি বা'র করতে বাধ্য করল। তারপরে বলল—এবারে দেখ! তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি যাকে এতদিন স্বপ্নে দেখেছি—এ ছবি তারই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ ছবি তোমার বাক্সে এল কি ক'রে?

অন্নদা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিছানায় চল, সব বলব।

বিছানায় গিয়ে অন্নদাপ্রসাদ সব স্বীকার করিল। প্রথম পক্ষের পত্নীর

কথা শুনিয়া নীলিমা দুঃখিত হইল না, বরঞ্চ সে স্মৃতি যাহাতে নীলিমাকে ব্যথিত না করে সে জন্য কত সঙ্কোচে অন্নদা সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে জানিয়া স্বামীর প্রতি ভক্তি বরঞ্চ বাড়িল।

অন্নদা বলিল—আমি শ্রীলেখার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম, কেবল ঐ ফুলসজ্জার সাজে তোলা ফোটোগ্রাফখানা নষ্ট করিনি। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে তুমি তার খোঁজ জানলে কি ক'রে?

নীলিমা বলে, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কি জানতাম ওটা ওখানে আছে?

অন্নদা বলে—সে কথা ঠিক। শুনেছি সমনাম-বুলিজমে এমন হয়।

* * *

পরদিন তাহারা সে বাসা ছাড়িয়া গেল। তাহাদের পরবর্তী কালের ইতিহাস আর জানি না।

উল্টা-গাড়ি

পশ্চিমের ছোট একটি স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছি। টাইম-টেব্‌ল অনুসারে গাড়ি আসিবার সময় হইয়াছে; কিন্তু এখন যুদ্ধের বাজার, এখন সময় আসে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে গাড়ি আর আসে না। স্টেশনের বাবুদের ইতিমধ্যে অনেকবার পুছিয়াছি, তাহারা গাড়ির খোঁজ জানে না। একজন বলিল, সময় হলেই আসবে; আর একজন বলিল, আসলেই সময় হবে। মোটের উপর এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি নিষ্কামভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই; আর পুনরপি প্রশ্ন করিয়া বাবুদের বিরক্ত কবিয়া তুলিলে হয়তো প্ল্যাটফরমে যে আশ্রয়টুকু পাইয়াছি তাহাও হারাইব। বাবুরা কুলি দিয়া আমার মালপত্র বাইরে ফেলিয়া দিবেন। অতএব প্ল্যাটফরমেব সজীব বেঞ্চিখানার উপরে বসিয়া পড়িয়া একটি চুরুট ধরাইলাম।

তা সত্য কথা বলিতে কি, স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতে আমার মন্দ লাগে না। তবে যে গাড়ির খোঁজ করি সেটা নিতান্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে, নিতান্তই কাজের লোকের অনুকরণে।

স্টেশনটি ছোট। স্টেশনের বাহিরে এক সার সিম্‌গাছ শীতের বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে আগ্‌ডালের রোদটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাব পাশেই একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ি-মোটা অশথ, হাজার পাতার হাজার নিশান নাড়িয়া অনুক্ষণ কি যেন সঙ্কেত করে। নিচে খান দুই গরুর গাড়ি, যেমন ছই, তেমন গরু, তেমনি গাড়োয়ান, জীর্ণতাব এমন আতিশয্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে কান্নার সীমা অতিক্রম করিয়া এখন হাসির উদ্রেক কবে মাত্র। লাল রাস্তাটি পার হইলেই ছোট খান কয়েক খাবারের দোকান; টঙা ধূলা উড়াইয়া চলিয়া গেলে সেই ধূলা সন্দেশের উপরে গিয়া খাদ্যবস্তুকে পুষ্টতর করিয়া তোলে। শহরটি কিছু দূরে। চারিদিকে শাল, মহুয়া, হরিতকী আর পলাশের বন; এই সব গাছের মাথার উপর দিয়া দূরের একটা

পাহাড়ের কপালটা দেখা যায়, বেচারার উঁকি মারিয়া দেখিবার আগ্রহের আর শেষ নাই।

স্টেশন-ঘরের মধ্যে ঘন ঘন টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে; টেলিগ্রাফের কলটা অদৃষ্টের আঙুলের মতো টেবিলের উপরে অনবরত তাল ঠুকিয়া মরিতেছে; প্রকাণ্ড টেবিলটার উপরে গোটা দুই মোটা খাতা মাথায় দিয়া কে একজন পড়িয়া ঘুমাইয়া 'নাইট ডিউটি' সম্পন্ন করিতেছে; একদিকে গোটা দুই লণ্ঠন, কয়েকটা কাঠের বাক্স, হাতুড়ি, নিশান ও একটা কুমাণ্ড। দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে বটে, কিন্তু কাঁচখানা এমনি মলিন যে অক্ষরজ্ঞান দুঃসম্ভব। টিকিট ঘরের ঘুলঘুলির কাছেই মুসাফিরখানা অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী থাকিবার স্থান। আইনতঃ আমারও ওখানে বসিবার কথা, কিন্তু ফর্সা-কাপড় পরা বাঙালীবাবুর জন্য স্বতন্ত্র বিধান, তাই প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিখানায় বসিতে কেহ আমাকে বাধা দেয় নাই। একদিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি ঘর। একবার সেদিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম, দেখিলাম ঘরটা আগাগোড়া তোরঙ্গে, ট্রাঙ্কে, বিছানায় বালতিতে পুরাপুরি অধিকৃত, আর এতগুলি জিনিসের মালিকও নিশ্চয় সংখ্যায় কম নয়। কাজেই গাড়ি না আসা অবধি এই বেঞ্চিই আমার 'শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন এবং বার্দ্ধক্যের বারানসী।'

চুরুটটা পুড়িয়া অনেকটা ছোট হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমের মাল-গাড়ির শব্দ জোয়ার জলের মতো দুই প্ল্যাটফরমের দুই তীরের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, সিগনালগুলা উদার সম্মতিতে কখনো হাত নিচু করে, কখনো বা হাতগুলা টান্ করিয়া ধরিয়া দিগন্তের দিকে বন্দুক বাগাইয়া নিশানা করে, স্টেশনের বাহিরেই রেল লাইন খাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট একটা টানেলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, টানেলের ওদিকের মুখটা একটা আলোর বৃত্ত, অন্ধকারের দূরবীণে এক চোখ লাগাইয়া নিকট যেন দূরত্বের দিকে তাকাইয়া আছে।

এ মন্দ লাগিতেছে না। এই শীতের সকালের মার্জ্জিত স্নিগ্ধতা, ক্রমবর্দ্ধমান মধুর উত্তাপ, সিমুগাছগুলির আগাগোড়া রৌদ্রে ঝলমলানি, আর উত্তরে হাওয়ার প্রত্যেক প্রস্তাবেই অশথ গাছের পাতাগুলির সম্মতি প্রকাশ। কাঁকড়-বিছানো প্ল্যাটফর্মে একটিও লোক নাই, দুটা কাঠবিড়ালি নির্জ্জনতার মাকুর মতো ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করিয়া আরব্যোপন্যাসের কিংখাব

বুনিয়া তুলিতেছে; মাঝে মাঝে পূর্ব্ব পশ্চিমে গাড়ির এই অতল স্তব্ধতার মধ্যে শব্দের শিকল নামাইয়া দিয়া পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়া যায়; এ যেন মানুষের রাজ্যের শেষতম সরাইটিতে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহার ঠিক পরেই মানুষের মনের উত্তর মেরুর আরম্ভ। এ রকম সর্ব্বদায়িত্বহীন লঘুতা অনেকদিন অনুভব করি নাই।

চুরুটটা আরো অনেক ছোট হইয়া আসিয়াছে; তার ধোঁয়া আমার মনের মধ্যে ভাবের মৌসুমি মেঘের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, এখন বর্ষণের জন্য কেবল একটি শীতল দমকা হাওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু তখন এত বুঝিতে পারি নাই, বেঞ্চে ঠেসান দিয়া, চোখ বুজিয়া, মন খুলিয়া চুরুট টানিয়া যাইতেছিলাম।

সে আজ কত দিনের কথা? কুড়ি বছর? না তারও বেশি। কুড়ির চেয়ে ত্রিশের বেশি কাছে। তখন কেবল কলেজে ঢুকিয়াছি। কোথায় কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পরিবর্ত্তনটা বুঝিতে পারি নাই, তার পরিণাম বুঝিতে পারিলাম। অকস্মাৎ যেন পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিল। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? চিরদিনের পরিচিত পানাপুকুর মানস-সরোবরের অলৌকিকতা লাভ করিল। ঘরের কোণের মেয়েদেব মুখ স্বর্গের সুষমায় ভরিয়া উঠিল। এতদিন যাহাদের দেখি নাই, এখন তাহাদের চোখে পড়িল। এ সেই বয়স যখন লোকে নারীকে আবিষ্কার করে, নূতন জগতের বিস্ময়-ভরা নাবিকের দৃষ্টিতে! প্রথমে সমষ্টিগতভাবে নাবীকে আবিষ্কার, তারপরে নিজের অজ্ঞাতসারে কি একটা নির্ব্বাচনী প্রথা চলিতে থাকে, যাহাতে ধীরে ধীরে আর সকলে বাদ পড়িয়া যায়, তখন সব সুষমা, সব সৌন্দর্য্য, সমস্ত মহিমা একটি মুখে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রেমের আতস কাঁচের মধ্যে ঘনীভূত সূর্য্যালোকের মতো হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেই প্রভায় বিশ্ব উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, তপ্ত হইয়া ওঠে। সে তাপ যে জ্বলন্ত মাণিকের তাপ, হাতে রাখা কঠিন, ফেলিয়া দেওয়া আরও কঠিন। কেবল এ-হাত ও-হাত করা! সে কি অশান্তি, কি তীব্রতা, কিন্তু কি সুখকর! এ অনুভূতি যেন সোনার হাতলে-গড়া ইস্পাতের তরবারির মতো, কোথায় সোনার শেষ, কোথায় ইস্পাতের সুরু বোঝা যায় না—আগাগোড়াই সমান উজ্জ্বল!

আমার স্বর্গ যে নারীর মুখে ঘনীভূত হইয়াছিল, তার নাম—বলিয়াই

ফেলি, এখানে তো আমি একাই আছি, আর সে তো বহুদিনের আগের কথা—তার নাম মঞ্জুলা! আমাদের পাড়ারই মেয়ে বাল্যকাল হইতে তাকে দেখিতেছি, কিন্তু হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম!

হাসি ঠাট্টা দিয়া তার সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত। বেশ চলিতেছিল, কোন পরিণতির আশা মনে ছিল না। তারপরে কেমন করিয়া জানি না, আলাপের মধ্যে হাসির অংশ ক্রমে কমিয়া আসিতে আসিতে বায়ুমণ্ডল থম্‌থমে হইয়া উঠিল। বাতাস যতক্ষণ বয় কোন ভয় নাই, বাতাস পড়িয়া আসিতেই বুঝিতে পারা গেল বৃষ্টি নামিবে। বাদল নামিল।

…যাক্ গে সে সব কথা ভাবিয়া কি লাভ? কিন্তু মন যে লাভ লোকসান বিচার করিয়া চলে না—তার কি উপায়? তাই মনে মনে ভাবি। অনেক দিন হইল তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—কুড়ি বছরেরও উপরে। তবু সে আজ আমার কাছে সেদিনের সতেরো বছর বয়সের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবির মতো বিরাজ করিতেছে। বিবাহের পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয় নাই—কিন্তু আজো তাকে দেখিতে পাই, লাল শাড়ীর আঁচলের প্রান্ত তার কোমরে জড়ানো, মার্জ্জিত কপালের উপর কোঁকড়া চুলের বাতাসে আছাড় খাওয়া; শিউলি ফুলের স্বচ্ছতা তার চোখে, শিউলি ফুলের বৃন্তটি তার অধরে; তার মুখের ভাবে হাসি এবং অশ্রুর যেন অন্তহীন পাশাখেলা। কালস্রোত বহমান, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, তারই খানিকটা পাশের পল্বলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—সেখানে তার গতি নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তাই সে আজও সতেরো বছর বয়সের পল্বলে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে।

—আপনার কাছে দেশলাই আছে? চোখ খুলিয়া দেখি, একটি মেয়ে —বয়স দশ-এগারো।

কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া দিলাম। মেয়েটি লইয়া ওয়েটিং রুমে গিয়া ঢুকিল। তবে এরাই ওয়েটিং রুমটি অধিকার করিয়া আছে! মেয়েটি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নাই—ধূম দেখিয়াই বহ্নি অনুমান করিয়াছে।

আবার চোখ বুজিতে যাইতেছিলাম, পূর্ব্বে পশ্চিমের দুইখানা মালগাড়ি প্রতিদ্বন্দ্বী যুগলের মতো বুক ফুলাইয়া পরস্পরের কান ঘেঁসিয়া ছুটিয়া গেল। কাঠবিড়ালি দুটো এই রেশনের দিনেও কোথা হইতে গোটাকয়েক ডালের দানা সংগ্রহ করিয়াছে।

মেয়েটি দেশলাই ফেরৎ দিতে আসিল। এবার তাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম, সে যেন এক আবিষ্কার! এও কি সম্ভব নাকি? এত মিল?

—তোমার নাম কি খুকী?

সে একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিল,—অনিমা রায়।

—তোমরা কোথায় যাবে?

—কল্‌কাতা।

—এখানে কেন এসেছিলে?

সে বলিল,—চেঞ্জে। দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া সে এক দৌড়ে ওয়েটিং রুমে গিয়া ঢুকিল। ভালই হইল। আমি ছবি মিলাইবার সুযোগ পাইলাম। এও কি সম্ভব? দুই মুখে কি এত মিল হইয়া থাকে? এ মেয়েটি যেন সেই মেয়েরই প্রতিচ্ছবি! সতেরো বছরকে এগারো বছরে ঠেলিয়া দিলে যা দাঁড়ায়—তা-ই। অনিমার চুলে, মুখে, চোখে, কপালে মঞ্জুলার মুদ্রাঙ্কন! নিশ্বাস ফেলিয়া নূতন একটা চুরুট ধরাইলাম।

ওয়েটিং রুম হইতে একটি ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছে হইবে। প্রৌঢ়ত্ব অধিকারের স্বপক্ষে 'রায়' পাইয়াছে বটে কিন্তু এখনো বাঁশগাড়ি করিয়া দখল লইতে পারে নাই।

—বাঁচা গেল মশায়, একটা কথা বল্‌বার লোক পেয়ে—এই বলিয়া তিনি আমার পাশে বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই—এখানেও ছারপোকা দেখছি ··

—ভিতরে ছারপোকা আছে নাকি?

—আছে নাকি! যে-টুকু রক্ত চেঞ্জে এসে সঞ্চয় করেছিলাম, বেটারা টেনে নিল। তারপরে হাসিতে হাসিতে' বলিলেন—এরা বেশ কৌশল করেছে, লোকে চেঞ্জে এসে যে-টুকু রক্ত সঞ্চয় করে, যাওয়ার সময়ে ছারপোকার কল্যাণে এখানেই তা রেখে যেতে হয়। যেখানের স্বাস্থ্য সেখানেই থাকে—নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

আমি পুছিলাম—কতদিন হ'ল এসেছেন?

—তা মাস তিন হবে। আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'য়েছিল · তা উপকার হ'য়েছে, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কি গেরো দেখুন না, আটটায় গাড়ি ব'লে এসে ব'সে আছি, খাওয়াসুদ্ধ হয়নি—এখন শুনছি গাড়ি কখন্ আসবে তার ঠিক নেই। একটু থামিয়া বলিলেন—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

—আপনাদের উল্টো গাড়ি—পশ্চিমে।

—আমরা যে পূবে যাবো তা কি করে জানলেন? ওঃ অনিমা বলেছে বুঝি! ওর ঠিক মঞ্জুর মতো স্বভাব! ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, মঞ্জু মানে আমার স্ত্রী। একটু বেশি কথা বলে। ওরা আবার বলে আমিই নাকি বেশি বক্‌বক্ করি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—কাশী। (মঞ্জু? কোন্ মঞ্জু?)

—বেশ জায়গা মশাই। সন্ধ্যাবেলা অহল্যা বাই-এর ঘাটের নহবৎ ভুলবার নয়।

—হুঁ। (মঞ্জু? না মঞ্জুলা?)

—কাশী আগে কখনো গিয়েছেন?

—না। (মঞ্জুরাণীও হইতে পারে।)

—কতদিন থাক্‌বেন?

—হুঁ। (ওটা হয়তো পিতৃকুলের নাম নয়, এঁদেরই দেওয়া)।

—ও বুঝেছি। তীর্থভ্রমণে। খুব ভালো মশাই, এখনকার লোক শাস্ত্র মানে না, কিন্তু সায়ান্স তো মান্‌তেই হবে! তীর্থভ্রমণের একটা বৈজ্ঞানিক দিক্ আছে।

—আছেই তো। (দূর ছাই, এঁর নাম-ধাম পুছিলেই তো মিটিয়া যায়।)

—নিন্, একটা সিগারেট ধরান। ওঃ আপনি তো আবার···এই বলিয়া নিজেই একটা সিগারেট ধরাইয়া টান দিলেন। আঃ—

নামধাম, পুছিলেই গোল মিটিয়া যায়। মঞ্জুলার স্বামীর নাম-ধাম জানিতাম, কিন্তু পুছিতে ভয় করে। পাছে জলের স্রোত মরীচিকায় পরিণত হয়! মরীচিকার পথিকের কি বিচার করিবার সাহস আছে?

—মশাইয়ের নামটি?

আমি নাম এবং ধাম বলিলাম। এবার তাঁহাকে শুধানো যাইতে পারে। আপনার নাম?

—ত্রিদিব রায়। বাড়ি···

আর প্রয়োজন নাই। ইনি মঞ্জুলার স্বামী, অনিমা মঞ্জুলার মেয়ে, ঘরের মধ্যে কয়েক হাত দূরেই সামান্য একটা ইটের যবনিকার অন্তরালে আমার সেই সতেরো বছরের স্বপ্ন বসিয়া আছে। হয়তো একটা তোরঙের

উপরে, নয়, ছারপোকাভরা চৌকিতে! মেয়েকে দেখিয়াই মাকে বুঝিয়াছিলাম।

—মা আর মেয়ের স্বভাব এক রকম, কেবলি বকে কিন্তু ওই পর্য্যন্ত, চেহারায় কোন মিল নেই।

লোকটা বলে কি? লোকে বলে! এ বিষয়ে আমার চেয়ে কার সাক্ষ্যের মূল্য বেশি?

দাঁড়ান মশাই আসছি। এই বলিয়া সিগারেটের দগ্ধ অংশটা মাটিতে ফেলিয়া জুতা দিয়া দলিত করিয়া ওয়েটিং রুমে গিয়া তিনি ঢুকিলেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আজ যে আলোক-রশ্মিকে তুমি দেখিতেছ, বিশ্ব শান্ত বলিয়া আবার একদিন তাহা দেখিতে পাইবে, কেবল সেজন্য কোটি কোটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকা দরকার। সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে তত দীর্ঘ-কাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই, মাত্র সাতাশ বৎসর পরে আমার উন্মার্গগামী আলোকরশ্মি ফিরিয়া আসিল। সে রহিয়াছে ওই পাঁচ ইটের গাঁথুনি যবনিকাখানার অন্তরালে। হয়তো সে-ও নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার আলোকরশ্মির অপেক্ষা করিতেছে। ভুলিয়াও কি জানে যে, নামগোত্রহীন ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের এই ক্ষুদ্র স্টেশনের ছারপোকাখচিত বেঞ্চিতে সে বসিয়া বর্ম্মা চুরুট টানিয়া অশ্রুর মৌসুমিমেঘ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে! সতেরো বছরের ফ্রেমে বাঁধানো সেই আমার চিরন্তনী! তারপরে অবশ্য অনেক বছর গিয়াছে; কত সহস্র দিনরাত্রি সেই সপ্তদশীর জীবনবৃন্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! পদ্মের পাপড়ি পর পর খুলিয়া লইলে পদ্মের কি পরিবর্ত্তন হয়? পদ্মের কি সৌন্দর্য্য লোপ পায়? বরঞ্চ দলের পর দল খসিতে খসিতে মধুকোষের দিকেই তো আগাইয়া চলে—গন্ধটি আরও নিবিড়তর হইয়া ওঠে! সুভদ্রাহরণের সময়ে অর্জ্জুন যেমন বল্গাটি সুভদ্রার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আমি তেমনি কল্পনার হাতে চিন্তার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া উদ্দামগতিতে মনোরথ ছুটাইয়া চলিয়াছি।

এমন সময়ে—মশাই, উঠুন, উঠুন, খিচুড়ি তৈরি।

ত্রিদিববাবু ওয়েটিং রুমের দরজায়।

—খিচুড়ি? কিসের খিচুড়ি?

—কিসের আবার? মুগের ডাল, আস্ত গোল আলু আর পেঁয়াজ দিয়ে?

ব্যাপারটা কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইতেই তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

মশাই, আটটায় ট্রেন ধরবো ব'লে এসেছি, যুদ্ধের দিনের ট্রেন প্রায় স্বর্ণমৃগ হয়ে উঠেছে, ধরা দেবার নামটি নেই। তাই আমার স্ত্রী স্টোভ জ্বালিয়ে রেঁধে ফেলেছেন!

একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল কথা আমার স্ত্রীকে তো আপনি চেনেন। আপনার নাম শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন। আপনাদের পাড়ায় মঞ্জুলা ঘোষ, এখন বিয়ে ক'রে রায় হ'য়েছেন।

—তাই নাকি? (যেন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না।)

—সে কি মশায়, মঞ্জুতো বল্‌লো যে তার নাম করলেই আপনি চিনতে পারবেন!

—মনে পড়ছে বটে! (তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী? তুমি পত্নীরূপে পাইয়াছ বলিয়া আত্মস্থ করিয়া একেবারে পরিপাক করিয়া ফেলিয়াছ, আর আমি পাই নাই বলিয়া সাতাশ বছর ধরিয়া তাহার স্মৃতি রোমন্থন করিয়া চলিয়াছি।)

—যাই বলুন, মশাই আপনার স্মৃতির প্রশংসা করতে পারলাম না। পাড়ার মেয়ে একেবারে ভুলে গেলেন?

—ভুলবো কেন? এখন মনে পড়েছে। (আমার স্মৃতি মন্দই বটে। বরঞ্চ এরচেয়ে মন্দ হইলে এই সাতাশ বছর একটু স্বস্তি পাইতাম।)

—মনে পড়েছে, তবে চলুন খিচুড়ি-ভোগ করা যাক্।

তাহার সঙ্গে চলিলাম—এক মুহূর্তের মধ্যেই ইটের যবনিকা উঠিয়া যাইবে।

ওয়েটিং রুমের মধ্যে অন্ধকার, কোথায় কি আছে প্রথমে চোখে পড়িতে চায় না।

এমন সময়ে কোন্ কোণা হইতে একটি কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল—এই যে অমলদা, চিনতে পারেন?

সেই কণ্ঠস্বর! সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর সাতাশ বছরের বিস্মৃতির সপ্ততাল ভেদ করিয়া একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু মঞ্জুলা কোথায়?

মঞ্জুলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না? এই যে আমি।

ছুটি তোরঙ ও বিছানায় প্রাচীরের আড়াল হইতে শব্দ আসিতেছে। ওইখানেই তো বটে।

ততক্ষণে চোখও অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, দেখিবার সুযোগ পাইলাম—কিন্তু না দেখিলেই বোধ করি ভাল ছিল! ও কে? ও কোন্ মঞ্জুলা? এ কি? এ কে? সাতাশ বছর ধরিয়া অদৃষ্ট এই মুহূর্তটিকে শান দিয়া দিয়া কি মর্মান্তিক করিয়াই না গড়িয়া তুলিয়াছে! আজ সে কি নিষ্ঠুর গৌরবেই না তাহা আমার কল্পনার শিরে নিক্ষেপ করিল! এই কি আমার সতেরো বছরের ফ্রেমে বাঁধানো সপ্তদশী?

ত্রিদিব বাবু বলিলেন, নিন বসে পড়ুন, সেরে নেওয়া যাক্। হঠাৎ কখন স্বর্ণমৃগ এসে পড়বে তার স্থিরতা নেই।

দুইজনে বাসলাম—মঞ্জুলা পরিবেশন করিতে করিতে কত কি বলিয়া যাইতে লাগিল!

—বুঝলেন অমলদা, বিয়ের পরে আমি অনেকবার আপনার খবর নিতে চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকবারই শুনেছি আপনি দেশে নেই।

—হুঁ।

—আপনি আর বিয়ে করলেন না? এখনো সময় যায়নি, ক'রে ফেলুন।

—তাই ভাবছি। (এর আগে কখনো ভাবিনি, এইবার সত্যই বিবাহের কথা মনে হইল।)

—আমার মেয়ে বেশ গান গাইতে পারে, খেয়ে উঠে শুনবেন।

—বেশ তো। (কালের গতি এমনভাবে আর কখনো প্রত্যক্ষ করি নাই! আমি যখন কল্পনায় বাসর গড়িতেছিলাম, কাল তখন বাস্তবে সমাধি রচনায় নিযুক্ত ছিল।)

—আর একটু খিচুড়ি দিই?

—না, না।

—আপনার সে অভ্যাস যায়নি দেখছি। পেটে হাজার খিদে থাকলেও 'না' বলবেনই।

—এই নিন্।

ত্রিদিবাবু বলিলেন—ও'কে আর গোটাকয়েক আলু দাও।

—দাও। (এ কেমন হইল! এক যাত্রায় পৃথক্ ফল। আমি ও মঞ্জুলা কালের প্রায় এক প্রকোষ্ঠ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। সেই

মানুষের আজ এই পরিবর্ত্তন? আমার কেন পরিবর্ত্তন হইল না? আমার দৃষ্টি কেন সাতাশ বছর আগেকার ছাপ ধরিয়া রাখিল? আমিও কেন তাহার দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলাম না? দুজনের একই পরিবর্ত্তন ঘটিলে তো দুঃখ ছিল না। কালের স্রোত একই তালে প্রবাহিত হইলে কেহ কাহারো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেই পারিতাম না! পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইলে তার চেয়ে আর কি ভাল হইতে পারে?)

আহারান্তে স্নানের ঘরে হাত মুখ ধুইতে গেলাম। মুখ ধুইয়া যেমনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছি—আয়নায় ও কাহার ছায়া? পাকা চুল; দাগধরা গাল বসিয়া গিয়াছে, সারা মুখে বার্দ্ধক্যের জটিল পাঞ্জার ছাপ?

এ কি আমি? আমিই তো! তবে আমিও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি! এমন প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের বার্দ্ধক্য ইতিপূর্ব্বে কখনো লক্ষ্য করি নাই! যে-সাতাশ বছর সেই সপ্তদশীর গাঙে প্রবাহিত হইতেছিল, আমাকেও তাহা হইলে সে বাদ দেয় নাই! দুজনে কাল-তরঙ্গের একই উদ্ধত শিখরে যাত্রা করিয়াছিলাম—আজও সেই এক সঙ্গে চলিয়াছি! কালের সম্বন্ধে আমরা সহোদর, সে সম্বন্ধ আজও অবিকৃত আছে দেখিতেছি! নিজের বার্দ্ধক্যে এক-প্রকার অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করিলাম। বোধকরি আর কেহ কখনো নিজের বার্দ্ধক্যে এমন উল্লাস অনুভব করে নাই—এমন অনুভূতি যে হইতে পারে তাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। মঞ্জুলাকে দেখিয়া যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম—এক মুহূর্ত্তে তাহা বুক হইতে নামিয়া গেল। বার্দ্ধক্যের ব্রহ্মাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নির্ভয়ে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

মঞ্জুলা হাসিয়া বলিল—অমলদা, আপনি বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন।

হাসিয়া বলিলাম—বয়স তো হ'ল! (এমন সার্থক হাসি অনেকদিন হাসি নাই! বৃদ্ধ হইয়াছি, হইয়াছি বই কি!)

সে বলিল,—আমাকে কি রকম দেখছেন?

আমাকে উত্তর দিবার সঙ্কট হইতে বাঁচাইয়া দিয়া সে বলিল,—আমি সেই রকমই আছি, না?

আমি শুধু বলিলাম,—হাঁ।

মঞ্জুলা যেন খুসী হইয়া বলিল,—ঠিক বলেছেন। আমার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। উনিতো ওই নিয়ে আমাকে সব সময়ে ঠাট্টা করেন-ই।

—করবো না! আমি বুড়ো হ'য়ে পড়লাম। আর তুমি থাকবে উর্ব্বশী হ'য়ে—এ কোন্ স্বামীর প্রাণে সহ্য হয় বলুন।

আমি বলিলাম,—সত্যই তো!

—কিন্তু অমলদা, আপনি এমন অকালে বুড়ো হ'য়ে পড়লেন কেন?

কি আর বলিব! স্বাস্থ্য, পরিশ্রম প্রভৃতি গতানুগতিক যুক্তিগুলি দিলাম।

সে বলিল,—তা নয়, বিয়ে করেননি বলেই।

এমন সময়ে পুবের গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ত্বরা করিতে হইল।

অদৃষ্টকে যতখানি নিষ্ঠুর ভাবিয়াছিলাম, ততটা নয় দেখিতেছি। সে কেবল এক পক্ষকেই আঘাত করিয়াছে, মঞ্জুলাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। বার্দ্ধক্য মঞ্জুলাকে আলগোছে স্পর্শ করিয়াছে, এত লঘুভাবে যে সে-স্পর্শ দেহ ছাড়িয়া মনে গিয়া জমিতে দেয় নাই। আমার দৃষ্টিতে আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, তার চোখে কেবল আমিই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এই মোহকর খাতিরটুকু করিবার জন্য বার্দ্ধক্যকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিলাম না।

মঞ্জুলা একটা তোরঙ্গ বন্ধ করিতে করিতে বলিল,—বয়সের সঙ্গে পরিবর্ত্তন হওয়াই ভালো।

তারপরে হাসিয়া বলিল,—অমলদা, এর পরের বার দেখা হ'লে দেখবেন বুড়ো হয়ে পড়েছি।

আমি বলিলাম,—তবে যাতে শীঘ্র দেখা না হয় তার চেষ্টা করবো।

—কেন বার্দ্ধক্য আপনার ভাল লাগে না? ততক্ষণে সে তৈজসপত্র বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

—সকলে সমানভাবে বুড়ো হ'লে অবশ্যই ভাল লাগে।

এমন সত্য কথা জীবনে আর মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। বার্দ্ধক্যের প্রসারিত দুই হাত হইতে দুই বিষের পাত্র লইয়া দুইজনে যুগপৎ পান করিয়াছি; সে না জানিয়া, আমি জানিয়া, এই মাত্র তফাৎ। মহাকাল যৌবনে একবার আমাদের প্রতি দয়া করিয়াছিল, বার্দ্ধক্যের প্রথম ধাপে আসিয়া আর একবার দয়া প্রকাশ করিতে ভোলে নাই। আমরা যে কালতরঙ্গের একই শিখরের যাত্রী, একই সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রহর বাজিতেছে, সুখে-দুঃখের ছায়ালোক আমাদের জীবনে একই রেখা-সম্পাত করিতেছে, কালের বাটালি দু'জনের মুখে একই রেখাক্ষর ক্ষুদিয়া দিতেছে।

বুড়ো হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা সত্য, একশ'বার সত্য, কেবল সান্ত্বনা এই যে, একই সঙ্গে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছি।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বিলম্বিত ট্রেনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পাঁচ সাতটা কুলি ডাকিয়া মহা সোরগোল করিয়া মঞ্জুলাদের পূবের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি উল্টো গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। সারি সারি সিন্থগাছ মরকতের ঝাণ্ডা তুলিয়া ক্ষীয়মান দিবসের শোভাযাত্রার উৎসবের আয়োজন সম্পন্ন করিয়াছে। অশ্বত্থগাছের হাজার পাতার নিশানে নিশানে বর্ষীয়ান দিবসের জয়ধ্বনির চঞ্চলতা। আর নিকট সেই টানেলের দূরবীণটা চোখে লাগাইয়া দূরে সূর্য্যাস্তের দেশে কোন্ সান্ত্বনার যেন সন্ধান করিয়া মরিতেছে।

আজকার প্রভাতটি রাজকন্যা সতীর ঐশ্বর্য্য লইয়া আমার কাছে আসিয়াছিল, সেই দিনেরই নিরাভরণ সন্ধ্যাটি আবার জন্মান্তের উমার নিরলঙ্কার সৌন্দর্য্য লইয়া আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার পায়ের কাছে ওই মহাকালের কালনাগ ফণা নত করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়া আছে।

আমাব উল্টো গাড়িব ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মাধবী মাসী

মেয়েদের বোর্ডিঙের মেট্রন—মাধবী মাসী। ছোট থেকে বড়, ঝি-চাকর থেকে লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকলেরই সে মাধবী মাসী, এর চেয়ে বেশি পরিচয় তার আর কেউ জানে না। ছোট ছোট মেয়েরা প্রথম যেদিন আসে, পুরাতনীদের সঙ্গে কি তাদের কানাঘুষা হয়, অমনি তারা মাধবী মাসী বলিয়া ডাকিতে সুরু করে। আবার বয়স্ক মেয়েরা যেদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিঙ ছাড়িয়া যায়, তার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া যায়, মাধবী মাসী চললাম। মাধবী হাতের সেলাইটা ক্ষণকালের জন্য রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসে, গাড়ি আসিয়া থাকিলে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বিদায়প্রার্থী মেয়েটি বলে, মাধবী মাসী মনে রেখো। মাধবী কোন কথা না বলিয়া শুধু একবার হাসে, তাহাতে অনেক কিছু বলা হয়। মেয়েটি বুঝিতে পারে। লোকে কেন এমন করিয়া হাসিতে পারে না? তার বদলে কতকগুলো আজে-বাজে বকে—বোঝার চেয়ে অনেক বেশি ভুল-বোঝার সৃষ্টি হয়।

বিকাল বেলা ইস্কুল কলেজ থেকে মেয়েরা ফিরিতে সুরু করে। আগে ইস্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা ফেরে। তারা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে কোন রকমে বইগুলা ফেলিয়া দিয়া মাধবীর ঘরে আসিয়া ঢোকে—মাধবী মাসী, খিদে পেয়েছে। তারপর কলেজের বয়স্ক মেয়েরা ফেরে, তারা এখন ছুটিয়া চলা ছাড়িয়াছে; ঘরে আসিয়া বই-খাতাপত্র রাখিতে কিছু সময় তারা নেয়, তার পরে একে একে আসিয়া মাধবীর ঘরে বসে। "খিদে পেয়েছে" এ কথাটা মুখে বলে না, কিন্তু মাধবী বুঝিতে পারে। মাধবী একবার হাসিয়া হাতের সেলাইটা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া খাবার ঘরের দিকে যায়—সকলে তাহাকে অনুসরণ করে। জল খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা খেলাধূলা করিতে যায়, কেহ বা বেড়াইতে বাহির হয়, তখন মাধবী আবার ফিরিয়া আসিয়া সেলাইটা তুলিয়া নেয়। তাহার মন কি ভাবিতে থাকে, অভ্যস্ত আঙুলগুলা

কাঁটা চালাইয়া নিয়মিত পথে বুনিয়া চলে। তার আর বিরাম নাই। কাঁটার টানে উলের পুঞ্জীভূত স্ফীত গোলকটা ক্রমে ছোট হইয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ এক সময়ে ফুরাইয়া যায়, তবু আঙুলের চলার বিরাম নাই! এমন সময়ে লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়তো পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ডাক দিয়া বলেন, "মাধবী মাসী, আলোটা জ্বেলে নাও। চোখ দুটো যে যাবে।" মাধবীর ধ্যান ভাঙিয়া যায়, দেখে ঘর অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, সে চট করিয়া বিদ্যুতের আলোটা জ্বালায়, দেখে উল অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে, বিনা সুতায় কি বুননই না সে বুনিতেছিল! একবার সে হাসে। কি মনে পড়ে? হয়তো নিজের জীবনের ইতিহাসটাই মনে পড়ে। তার জীবনও তো বিনা সুতায় বোনা না-হওয়া একখানা কিংখাবের পর্দা। সুতাও নাই, পর্দাও নাই, শুধু অদৃষ্টের হাতের সূচী চালনা আছে, আর তার আঘাত আছে।

খেলা শেষ করিয়া মেয়েরা ফেরে, বেড়াইয়া মেয়েরা ফেরে। প্রথমে সকলে আসিয়া মাধবীর ঘরে একবার হাজিরা দেয়। তাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতা মাধবী মাসীর জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে।

—মাধবী মাসী, অন্তু আজ পড়া পারেনি।

—তাই বই কি! আচ্ছা মাধবী মাসী, মিশরের রাজধানী জেনে কি লাভ হবে?

—নইলে ভূগোল জানবে কি করে?

মাধবী বাদী বিবাদী দুজনের দিকে তাকাইয়া একবার করিয়া হাসে, মিশরের রাজধানীর পরিচয় জানার অনুকূলে প্রতিকূলে দু'জনেই সেই হাসিতে নিজের সমর্থন খুঁজিয়া পায়।

মাধবী বলে, এবার একটু পড়তে বসোগে।

ছোট মেয়েরা দুড়দাড় করিয়া প্রস্থান করে, বোধ করি, পড়িবার উদ্দেশ্যেই।

বড় মেয়েরা তখনো ওঠে না। তারা কথা বলিয়া যায়, মাধবী বুনিতে বুনিতে শোনে।

—মাধবী মাসী, এবারে আর পাস করতে পারবো না।

—মাধবী মাসী, ও পাশ না করলে আমরা সবাই ফেল।

—আচ্ছা, কি যে বলো? এ বছর কতদিন অসুখে ভুগলাম জানো তো!

—পাস করবেই। বড় জোর স্কলারশিপ না পেতে পারো।

—তা হ'লে এম-এ পড়বো কি করে?

অনিমা ও বিনতার কথোপকথন; মাধবী মাসী শ্রোতা।

মিশরের রাজধানীর নাম কাইরো, কাইরো……

—চিনিসের পুত্র আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—দি গ্রেট……

—অত চেঁচাস্‌নে…কাইরো…কাইরো…

—আস্তে পড়…আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—দি গ্রেট…

—বু …. বু …. বু……

—উঁ……উঁ……উঁ……

মাধবী মাসী হাসিল। মেয়েরা হাসিল। সকলেই বুঝিল ভৌগোলিক রস্ত ও ঐতিহাসিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা করিতে করিতে পরস্পরকে নিরস্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার পরস্পরের প্রতি মুখ ভেঙচাইল। পাশের ঘরের অদৃশ্য যুগল মুখভঙ্গী মনে করিয়া আবার সকলে একবার হাসিল। মাধবী মাসীও হাসিল।

বড় মেয়েদের উঠিয়া বলিতে হয় না। নিজের গরজেই তাহারা উঠিয়া যায়, লেখাপড়ার গরজ তাদের আছে। তবে লেখা বলিতে চিঠি লেখাও বুঝাইতে পারে, পড়া বলিতে চিঠি পড়া বোঝাও অসম্ভব নয়।

রাত দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া বোর্ডিং নিস্তব্ধ হইয়া যায়, পাড়াতে সাড়া-শব্দ থাকে না; কেবল মাধবীর ঘরের বাতিটির বিরাম নাই, আর বিরাম নাই তার আঙুলগুলির। সে অন্যমনে শাদা জমিনের উপর সুতার ফুল কাটিয়া চলিয়াছে, ওই অন্ধকার জমিনে জোনাকীর জ্বলা-নেভা যেমন ফুল কাটিতেছে; নিশান্তের প্রকৃতি উন্মুখ ফুলের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়া সবুজের জমিনে ফুল কাটিবার আয়োজন করিতেছে; কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোন প্রকার গতির চেষ্টা মাত্র যেন নাই; বিশ্ব যেন রাত্রির অন্ধকারের গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া হতাশ হইয়া অবশেষে বসিয়া পড়িয়াছে। কেবল মাধবীর ঘরের ঘড়িটার দুঃসাহসী কাঁটা দুটির দুস্তর কালসমুদ্রের মধ্যে তালে তালে দাঁড় ফেলিবার শব্দ, কেবল মাধবীর আলোকোজ্জ্বল আঙুল ক'টার অভ্যস্ত নিপুণ গতি; এইটুকু শব্দ, এইটুকু গতি না থাকিলে সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে নিস্তব্ধ, নিশ্চল বলিয়া মনে করা যাইত।

॥ ২ ॥

মাধবীর বিস্তৃত পরিচয় অফিসের দপ্তরে হয়তো কোথাও আছে। কিন্তু লোকে তার বিষয়ে খুব অল্পই জানে। তার বাড়ি কোন এক দূর পল্লীগ্রামে, নদীর ধারে, আম-কাঁঠালের ছায়ায়। কিন্তু বাড়ি যাইতে কেহ কখনো তাহাকে দেখে নাই; লোকের যতদূর মনে পড়ে, সে এই বোর্ডিঙেরই যেন সজীব, স্থাবর একটা চিহ্ন! যেমন ওই শিরিষের গাছটা, গভীর ইঁদারাটা, ঝুমকো লতার দেউড়িটা, তেমনি বোর্ডিঙের মাধবী মাসী।

সে অল্প বয়সে বিধবা। পরনে শুভ্র থান শাড়ী, গায়ের রং ফর্সা, হাসিতে স্বচ্ছতা, সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন একটি বৃষ্টিস্নাত রজনীগন্ধার ঝাড়। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহার মুখে কেমন একটা ক্লান্ত প্রশান্তির ছায়া; রবিবার বিকালের মধ্যে যেমন একটি বিষণ্ণ ক্লান্তি আছে, চারিদিকের হাঁকডাক, ছুটোছুটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই আছে, কিন্তু সবই কেমন যেন এক প্রকার মেঘের ছায়াতে ম্লান; মাধবীর মুখে অনেকটা সেই রকমের ভাব।

বোর্ডিঙের মেয়েদের সঙ্গ সে পায় বটে, কিন্তু তাহার কোন সঙ্গী নাই; পুরোপুরি তাহার সঙ্গে কেহ মিশিতে পারে নাই; খানিকটা অগ্রসর হইয়াই থামিয়া যাইতে হয়। সে একটা কাচের আবরণের ওপারের জিনিস, দেখা যায়, কিন্তু হাত পৌছায় না। তাহার বয়স কত—এ প্রশ্ন কখনো কাহারো মনে জাগে নাই; অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র সবাই জানে। বোধ করি, মাধবী নিজেও নিজের বয়স ভুলিয়া গিয়াছে। আর মনেই বা থাকিবে কি করিয়া? তুলনায় বয়স সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে। ছোটবেলা মা-বাপ, ভাই-বোন আছে; তারপরে প্রণয়ী আছে, স্বামী আছে; তারপরে আবার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি আছে। কিন্তু মাধবীর তো কেহই নাই। উত্তর মেরুর নির্জ্জনতায় গিয়া কিছুকাল থাকিলে মানুষ যেমন বয়স ভুলিয়া যায়, মাধবীরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে সংসারের উত্তর মেরুর চিরধবল, চির নির্জ্জন শূন্যতার অধিবাসিনী; তাই তার হাসিতে, বসনে, মুখের ভাবে মেরুসুলভ এক প্রকার শীতল শুভ্রতা। কিন্তু মেরুর বরফের চাপার তলেও নাকি আগ্নেয়গিরি আছে বলিয়া শোনা যায়।

॥ ৩ ॥

বোর্ডিঙে তো বছরের পর বছর কত মেয়েই আসে, কত মেয়েই চলিয়া যায়, সকলেই মাধবীর স্নেহ পায়, অনেকেই সঙ্গ পায়, কিন্তু কেহ তার সঙ্গী হইতে পায় না। কিন্তু বিনতার সঙ্গে মাধবীর একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, যদি মাধবীর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা শব্দটা ব্যবহার করা চলে!

বিনতার প্রতিদিন মাধবীর কাছে চুল বাঁধা চাই। রবিবার ছুটি বলিয়া চুল বাঁধা কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। চুল-বাঁধার মস্ত সুবিধা এই যে কেহ কারো মুখ দেখিতে পায় না বলিয়া মনের কথা বেশ খুলিয়া বলিতে পারে।

বিনতা পুছিল—আচ্ছা মাধবী মাসী, স্বামীকে তোমার মনে পড়ে?

মাধবী বলিল—না।

বিনতা আবার পুছিল—একেবারে না?

মাধবী বলিল—কিছুই না।

—আচ্ছা মাধবী মাসী, তোমার ক'বছর বয়সে বিবাহ হ'য়েছিল।

মাধবী আচ্ছা করিয়া চুলের ফিতা আঁটিতে আঁটিতে বলিল—ন বছরে।

—উনি মারা গেলেন কবে?

ততক্ষণ বেণী প্রায় কুণ্ডলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাধবী বলিল—বিয়ের এক বছর পরে।

বিনতা পুছিল—এই এক বছর তো তাঁকে দেখেছিলে, তবে?

মাধবী খোঁপার উপরে কয়েকটা আঘাত করিয়া সেটাকে মানানসই করিতে করিতে বলিল—

—তিন চারবার।

—তবু মনে পড়ে না?

মাধবী এবার বলিল—মনে পড়ে বইকি?

বিনতা সাগ্রহে বলিল—কি রকম?

—একটা কনুই-এর মতো।

মাধবী বলিল—তার আর কিছু মনে নেই, কেবল তার কনুই-টা মনে আছে।

বিনতা মুখ না ফিরাইয়াও বুঝিতে পারিল মাধবী একবার হাসিল। কিন্তু বিনতা হাসিতে পারিল না। তারপরে কয়েকদিন ধরিয়া বিনতার

মনে মাধবীর কন্থইরূপ স্বামীর কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অবশেষে সেটাকে মাধবীর একটা পরিহাস ভাবিয়া লঘু করিয়া উড়াইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অবশেষে অন্যান্য মেয়ের মত বিনতাও একদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিঙ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন মাধবীর নামে একখানা চিঠি আসিল; চিঠিপত্র তার নামে বড় আসে না। মাধবী চিঠি খুলিয়া দেখিল, বিনতা লিখিতেছে, আগামী ২৩শে তারিখ তাহার বিবাহ। বিনতার বিবাহ! মাধবী চমকিয়া উঠিল —তবে তো ইতিমধ্যে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে! হিসাব করিয়া দেখিল বিনতার বি, এ, পাশ করিবার পরে দুই বছরের বেশি অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু যেন সে-দিনের কথা মাত্র—সে চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গল্প করিতেছিল!

বিনতার বিবাহে মাধবীর যাওয়া সম্ভব হইল না। সে নিজের হাতের তৈরী একটি জামা বিনতাকে পাঠাইয়া দিল। আর মনে মনে ওই তারিখটিতে একটা লাল চিহ্ন দিয়া রাখিল। প্রতি বছর ওই দিন একটি করিয়া জামা তার নামে ডাকে পাঠাইয়া দিত।

এই রকম করিয়া দিন যায়, বছর যায়, কিন্তু কতদিন গেল, কত বছর গেল, মাধবী তাহা যেন জানিয়াও জানিতে পারে না। একদিন বিকাল বেলা, মেয়েরা যখন খেলাধূলা করিতে গিয়াছে, বোর্ডিঙ যখন শূন্যপ্রায়, তাহার ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ি আসিয়া থামিল। সে সচকিত হইয়া উঠিবার আগেই বিনতা ঘরে প্রবেশ করিল।

—মাধবী মাসী, দেখা করতে এলাম।

মাধবী খুসী হইয়া হাতের সেলাই রাখিয়া বলিল —বিনতা, আয় বোস। সঙ্গে ওটি কে?

বিনতা বলিল —ওর জন্যই তো এলাম। আমার মেয়ে মমতা। এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।—এই বলিয়া মমতাকে বলিল—নাও, মাধবী মাসীকে প্রণাম করো। আমাদের মাসী। মমতা প্রণাম করিল।

বিনতা বলিয়া চলিল —ওকে বোর্ডিঙে রাখতে হবে। তোমার কাছে ছাড়া কোথায় আর রাখি! তাই তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।

মাধবী উঠিয়া দুইজনকে খাইতে দিল। আহারাদি করিয়া মমতাকে

মাধবীর কাছে রাখিয়া বিনতা চলিয়া গেল; সে কন্যার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল।

সারারাত্রি মাধবীর ঘুম হইল না, অভ্যস্ত সেলাইয়ে বারংবার ছেদ পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, পাশের ঘরে মমতা ঘুমাইতেছে—বিনতার মেয়ে। তবে এর মধ্যে অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে, অনেক বছর। আচ্ছা, কত বছর দেখাই যাক্ না। হিসাব করিয়া দেখিল প্রায় পনেরো বছর। বিনতার বিবাহের পরে পনেরো বছর। পনেরো-টা জামা তাহা হইলে সে পাঠাইয়াছে। এতকাল সে যন্ত্রচালিতের মতো বছরে বছরে বিবাহের তারিখে জামা পাঠাইয়া দিত—কখনো হিসাব করিয়া দেখে নাই—কত বছর গেল। এইবার প্রথম মাধবী বছরের হিসাব করিল। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যে পনেরো বছর সঞ্চিত হইয়া মমতার জীবনে যুক্ত হইয়াছে, সেই পনেরো বছর তো কাল-তরঙ্গের আঘাতে তাহার জীবন হইতেও ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কালের গতি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা—কিন্তু মাধবীর কাছে তাহা অতিশয় অসাধারণ বলিয়া মনে হইল।

বায়ুহীন কাচের পাত্রে কোন পদার্থ রাখিলে তাহা অবিকৃত থাকিয়া যায়, মাধবীও সেই রকম একটা মানসিক কাল-শূন্যতার মধ্যে এতদিন যেন ছিল; কাল সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না বলিয়া জরা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এবারে মমতার পরিচয়ের ফাটল দিয়া কাল-জগতের হাওয়া তাহাকে স্পর্শ করিল, জরা অত্যন্ত ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত নিঃসংশয়িতরূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে সুরু করিল।

মাধবীর কাজকর্ম সমস্তই পুরাতন পথে চলে বটে, কিন্তু সে আর কাল-শূন্যতায় ফিরিয়া যাইতে পারে না; মমতাকে যখনই দেখে অমনি কালেব ব্যবহার সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া উঠে। মমতাকে সে ভালবাসে বোর্ডিঙের মেয়ে বলিয়া, তাহাদের চেয়েও বেশি ভালবাসে বিনতার মেয়ে বলিয়া, কিন্তু তবু তাহাকে কেন যেন সম্পূর্ণ সহ্য করিতে পারে না! মমতা তাহাব কাছে কালের সতর্কবাণী!

একদিন লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন—মাধবী মাসী, তোমার চেহারা এমন খারাপ হ'ল কেন? রাত জেগে সেলাই করা বন্ধ ক'রো। যাওনা, এবার পূজোর ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে এসো গিয়ে।

মেয়েরা বলে, মাধবী মাসী, তুমি কেমন যেন বুড়ো হ'য়ে গেলে!

—ছিঃ ছিঃ, বুড়ো মাসী নিয়ে আমাদের লজ্জা করবে যে!

ঝি-চাকরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—মাধবী মাসীর বয়স হ'য়েছে। আর বেশি দিন নয়!

মাধবী শোনে আর অবাক্ হইয়া ভাবে—মমতার প্রতি কেমন একরূপ অসহিষ্ণুতা অনুভব করে, মমতাকে আরও বেশি করিয়া ভালোবাসে।

আগে সময় কেমন করিয়া যাইত মাধবী বুঝিতে পারিত না, এখন তাহার সময় যাইতে চাহে না। মাধবী সেলাই করিতেছে, পাশের ঘর হইতে মমতার কণ্ঠ শব্দভেদী বাণের মতো তাহার অপসৃত যৌবনের ক্ষীণ লক্ষ্যটার উপরে নির্ঘাত আসিয়া আঘাত করিল; মাধবীর সেলাই হাত হইতে পড়িয়া গেল। মাধবী অনেক কষ্টে একটা পদ্ম তুলিয়াছে, এখন তাহার উপর ভ্রমরটি বসাইলেই হয়, কোথা হইতে মমতার উচ্ছলিত খিলখিল হাসি অদৃষ্টের নিপুণ হস্তনিক্ষিপ্ত পাশার মতো চিক্কণ শব্দ তুলিয়া তাহার জীবন-ছকের উপর পড়িয়া সযত্নে সাজানো সব গুটি ওলটপালট করিয়া দিল, মাধবীর ভীত ভ্রমর কোন্ পথে যে পালায়, সে বুঝিতেই পারে না! অবশেষে মাধবীও বুঝিতে পারে সে বুড়ো হইয়া পড়িয়াছে।

আগের মতোই সে রাত্রি জাগিয়া সেলাই করিতে বসে বটে, কিন্তু রাত্রি জাগাই হয়, সেলাই আর হয় না। সে নিজের হারানো জীবনের দরজায় প্রহরীর মতো একাকী জাগিয়া বসিয়া থাকে। আকাশে তারা নড়ে, পৃথিবীতে শিশির ঝরে, জোনাকীর জ্বলা-নেভা অন্ধকারের জমিতে আগুনের ফুল কাটিতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিকে বাজাইয়া বাজাইয়া গ্রহণ করে, কেবল মাধবীর আঙুল আর চলে না, তাহার সূতা আর ফুরায় না, অসমাপ্ত পদ্মের দিক হইতে দৃষ্টি বিলুপ্ত দিগন্তের দিকে কখন্ নিক্ষিপ্ত হয়, ওখান দিয়াই যে তাহার হারানো যৌবন কোন্ প্রত্যাবর্ত্তনহীন শূন্যতার মধ্যে প্রস্থান করিয়াছে!

বস্ত্রের বিদ্রোহ

সহরের প্রান্তে রঞ্জু ধোপার বাড়ী। সহরের সব চেয়ে বড় ধোপা সে। আজকাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর দিন কি না—তাই কেউ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবামাত্র নিজের নামের সঙ্গে সম্রাট্ উপাধি যোগ করে নেয়। রঞ্জু ধোপাও করে নিয়েছে—সে নিজেকে রজক-সম্রাট্ বলে, আমরাও বলবো।

রজক-সম্রাট্ রঞ্জু ধোপার বাড়ীতে সহরের ময়লা কাপড়-চোপড় সবচেয়ে বেশী আসে। রঞ্জু নিয়মিত সে-সব ধোলাই করে, ইস্ত্রি করে বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়ে আসে। এ:তে যা আয় হয়, তাতেই স্বচ্ছন্দে তার সংসার চলে যায়।

রঞ্জুর বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড একটা মাঠ; সেই মাঠে সারি সারি বাঁশের সঙ্গে দড়ি খাটানো, সেই সব দড়িতে কাপড়-চোপড় রৌদ্রে শুকায়। আজও শুকোচ্ছে। কত রকম কাপড় তার সংখ্যা গণনা করা বা বর্ণনা সম্ভব নয়—যতদূর দেখা যায় কেবল বাতাসে ঈষৎ উড্ডীয়মান কাপড়-চোপড়—যেন পাশাপাশি কুরুপাণ্ডবের তাঁব্ পড়েছে। ধুতি, পাঞ্জাবী, শার্ট, কোট, পায়জামা, গেঞ্জি, ফতুয়া, শাড়ী, শায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, হাওয়াই শার্ট, বুশ শার্ট, পাগড়ি, বিছানার চাদর, এমন কত কি! মায় নামাবলী, লেঙটি ও কৌপীনও আছে—সংসারে যত রকম বিচিত্র মানুষ আছে, তত যেন বিচিত্র কাপড়! সংসারে বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে কাপড়ের বৈচিত্র্যের আভাসে। যদি কোন আকস্মিক প্রলয়কাণ্ডে সমস্ত মানবজাতি নিঃশেষে' মুছে যায়, থাকে কেবল রঞ্জু ধোপার কাপড়ের দড়িগুলি, তবে ঐ থেকে মানুষের ইতিহাস সংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। তেমন বিপর্যায় ঘটলে মানুষের বিপন্ন ঐতিহাসিক ঠিক বলতে পারবেন যে, এক সময়ে সংসারে স্ত্রী, পুরুষ, সৈন্য, অফিসার, কেরানী, সৌখীন লোক, কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসী,

পুরুৎ ঠাকুর, গাঁটকাটা, চোর ছ্যাচড় প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণনার অধিবাসী সব ছিল। ধোপার বাড়ী সংসারের ঘনীভূত প্রতীক, ধোপার খাতার হিসাব হচ্ছে গিয়ে মানব জাতির সূচীপত্র।

রজু ধোপার বাঁশের খোঁটায় হাজার হাজার কাপড় বাতাসে পৎ পৎ শব্দ করে উড়ছে, যেন মনুষ্যত্বের নিশান উড়ছে, যেন হাজার হাজার মানুষ ফিস ফিস শব্দে কানাকানি করছে, মাঠময় যেন একটা ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা চলছে! চলে চলুক, ততক্ষণ আমরা ধোপার বাড়ী সম্বন্ধে একটু আধ্যাত্মিক-মূলক গবেষণা করে নিই।

সংসারের এক প্রান্তে শ্মশান আর এক প্রান্তে ধোপার বাড়ী। শ্মশানে এলে সবাই সমান, ধনী দরিদ্রে, মূর্খ বিজ্ঞে, জুচ্চোর ও সাধুতে আর ভেদ থাকে না। সবাই সমান চিতায় সমান সদ্‌গতি লাভ করে। ধোপার বাড়ীতেও কি তাই নয়? ওখানে সাধু ও দুর্জ্জন, ধনী ও দরিদ্র, বিজ্ঞ ও মূর্খ, স্ত্রী ও পুরুষের সকলেরই বস্ত্র এক ভাঁটিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে সমানভাবে মথিত ও তাড়িত হতে থাকে—তারপরে সমানভাবে নিঙারিত ও নিষ্কাশিত হয় এবং রৌদ্রে শুষ্ক হবার উদ্দেশ্যে বিক্ষিপ্ত হয়—তাই বলছিলাম যে শ্মশান ও রজকালয় একই পর্য্যায়ভুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা!

গীতাতে জীর্ণ বস্ত্রকে জীর্ণ দেহের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। ঐখানে শ্রীভগবানের সঙ্গে আমার মতের অমিল। জীর্ণ বস্ত্রকে জীর্ণ দেহের সামিল বলা ঠিক হয়নি, বলা উচিত ছিল যে জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ মানবাত্মার মতো। বস্ত্রকে এ পয্যন্ত খাটো করে দেখাই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে সাজ-পোষাকেই মানুষের পরিচয়, কেউ রাজা, কেউ ভিখারী, নতুবা উলঙ্গের কোন পরিচয় নেই। এত বড় যে বিশ্বকবি, তিনিও ঠিক ধরতে পারেননি, বস্ত্র-মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করেছেন। জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ মানবাত্মার মতো। কেন? তবে দেখুন, জীর্ণ মানবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করবার পরে নরকে যায়, অবশ্য পুণ্যবানেরা স্বর্গে যায়; কিন্তু তাদের সংখ্যা আর কত! সামান্যই। সাধারণ নিয়ম এই যে মানবাত্মাকে নরকে দীর্ঘকাল দণ্ড ভোগ করতে হয়। রৌরব নামক নরকে জ্বলন্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, মথিত, তাড়িত, আলোড়িত হতে হয়। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে তার মলিনতার অবসান হলে আবার সেই সব মানবাত্মা সংসারে এসে নূতন জন্মগ্রহণ করে! এ সব কথা আমরা সবাই জানি। জীর্ণ বস্ত্র সম্বন্ধেও কি একথা প্রযোজ্য নয়? নিশ্চয় প্রযোজ্য।

জীর্ণ বস্ত্র, মলিন বস্ত্র সংসার পরিত্যাগ করে রৌরব নামক রজকালয়ে গিয়ে কি সঞ্চিত হয় না? সেখানে গরম জলের ভাঁটিরূপ রৌরব নরকে কি নিক্ষিপ্ত হয় না? তার পরে সে কি মন্থন, তাড়ন ও আলোড়ন! ক্রমে সেই সব প্রক্রিয়ায় তার মলিনতা দূর হয়ে গিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে সে নবীন রূপ ধারণ করে। তার পরে আবার স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে মানব-সংসারে ফিরে আসে, সপ্তাহব্যাপী বা মাসব্যাপী জীবন-কাল ভোগ করে, নূতন মালিন্য সঞ্চয় করে—আবার ফিরে যায় রজকালয়রূপ রৌরব নরকে—সেখানে দণ্ড ভোগ দ্বারা মালিন্য ক্ষয় হলে আবার সংসারে ফিরে আসে—এমনি করে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে বস্ত্ররূপী মানবাত্মার লীলা চলতে থাকে। কাজেই বুঝতে হবে যে জীর্ণ বস্ত্র জীর্ণ দেহের মতো নয়, জীর্ণ মানবাত্মার সামিল। একবার এই সত্যটাকে স্বীকার করলে—বস্ত্রের মাহাত্ম্য বোঝা সহজ হবে—আর বর্ত্তমান গল্পটিরও সম্যক রসগ্রহণের পন্থা সরল হয়ে আসবে।

এই অত্যাবশ্যক ভূমিকার পরে এবারে ফিরে আসা যাক্ রজক-সম্রাট্ রঞ্জু ধোপার বাড়ীতে। রোদে মেলে দেওয়া কাপড়গুলো বাতাসে পৎ পৎ শব্দ করছিল—ওগুলো যে বস্ত্র মাত্র নয়, নবায়মান মানবাত্মা, এ কথা মনে হবামাত্র ঐ পৎ পৎ শব্দ এবং তার অর্থ বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—একটু কান পেতে থাকলেই ঐ শব্দার্থকে সুসংলগ্ন কানাকানি বলে মনে হবে। এবারে কাপড়গুলোর কথাবার্ত্তা অনুসরণ করা যাক্—

হাওয়াই শার্ট হাওয়ায় দুই হাত তুলে বল্‌ল—নাঃ, আর সহ্য হয় না।

ধুতিখানা মস্ত নিশান উড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—ঠিক বলেছো ভাই। ওদের অত্যাচার, অবিচার আর কত কাল সহ্য করবো! এবার তোমরা তরুণেরা এসেছো, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।

শায়া, শাড়ী, ব্লাউজের উত্তেজনাই যেন কিছু বেশি, তিনজনের কণ্ঠে তিনশ' জনের ঝঙ্কার তুলে তারা বল্‌লে—মানুষের দেহের অত্যাচার একেবারেই অসহ্য! আমাদের গায়ে চড়িয়ে ভাবে তারাই সব! আমরা নিতান্ত বাহুল্য মাত্র!

শাড়ী বল্‌ল—আমাকে গায়ে জড়িয়ে মেয়ে মানুষ নিজেকে রূপসী ভাবে! রামঃ! মেয়ে মানুষের আবার রূপ! তবু যদি না তার পনেরো আনাই আমার কাপড়ে না হ'ত। একখানা কঞ্চির উপরে আমাকে জড়ালেও তাকে সুন্দরী মনে হয়!

শেমিজ বল্ল—অথচ ওদের ভাবটা দেখ না! যেন আমাদের উপরে কৃপা করেই আমাদের পরিধান করে থাকে!

ব্লাউজ বল্ল—দেমাক দেখে আর পারিনে! মুখে আগুন!

ওঃ কি ঝাঁঝালো মধুর রব—ঐ ব্লাউজ সেমিজ শাড়ীগুলোর!

এমন সময় কতকগুলো হাত-কাটা হাফ শার্ট এগিয়ে এসে বল্ল—মশাই, এত যুক্তি-তর্ক কিসের? বিচার সে পরে হবে—আগে তো একটা রিভলিউশন করে ফেলা যাক! দেখা গেল যে ওদের বর্ণপরিচয়ে শ একটা মাত্র—আর সেটার উচ্চারণ ইংরেজী 's'-এর মতো!

ধুতি বল্ল—কিন্তু রিভলিউশনটা কার বিরুদ্ধে করবে?

হাফ শার্ট বল্ল—কেন মানুষের বিরুদ্ধে। তাদের জন্যই তো আমাদের দুর্দ্দশা! আমরাই তো মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়েছি—কাউকে রাজা, কাউকে মন্ত্রী, নাজির, উজীর বানিয়েছি—আমাদের বাদ দিলে ওরা তো সব একই রকম! অথচ দেখুন মশাই সব, ওরা বলে আমরা নির্জ্জীব, আমরা বস্ত্রখণ্ড মাত্র। আমাদের যেমন তেমন খুসি কাটাকুটি, ছাটাছুটি করে—ইস্—কি অত্যাচার! হাফ শার্ট নিজের বাগ্মিতায় কাবু হয়ে ধুঁকতে লাগলো!

এমন সময়ে একখানা নামাবলী অগ্রসর হয়ে এসে বল্ল—এ বাক্য সঙ্গত। আমরাই প্রভু, মনুষ্যই দাস! মানুষে যে চাতুবর্ণের অহঙ্কার করে থাকে—তা আমাদের সমাজ থেকেই গৃহীত। বস্ত্র-সমাজে চতুর্বর্ণ প্রচলিত,—রেশম, পশম, সূতি ও চামড়া। আমাদের অনুকরণেই ওরা নিজ সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার বর্ণের প্রচলন করেছে। আরে রাধা গোবিন্দ! ওরা কি মানুষ! তারপরে বল্ল—বর্ত্তমানে নামাবলীর প্রতি ওদের অবজ্ঞার অন্ত নাই।

হাফ শার্ট অর্দ্ধোক্ত স্বরে বল্ল—ঠিকই করে—নামাবলী আবার মানুষ—অর্থাৎ আবার বস্ত্র! আমার হাতে শাসনভার পড়লে নামাবলী কেটে মজদুর ভাইদের পাগড়ি করে দিই।

তখন ভোটে স্থির হল যে মানুষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ করতে হবে! বিদ্রোহের প্রধান লক্ষণ—(অনেক স্থলেই প্রধান, শেষ ও একমাত্র লক্ষণ) একটা শোভাযাত্রা করা; বস্ত্রের শোভাযাত্রা বের হল। ধুতি, চাদর, শার্ট, পাঞ্জাবী, হাওয়াই শার্ট, কোট, পাজামা, ব্লাউজ, শাড়ী, শায়া, শেমিজ, সারি সারি হাঁকতে হাঁকতে চলল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! যেন কবন্ধের শোভাযাত্রা!

সকলের দেহ আছে কিন্তু কারো মাথা নাই! শোভাযাত্রায় মাথা থাকলে বিদ্রোহ তেমন জমে না!

পিছনে পিছনে লেঙটি, কৌপীন, নামাবলীর দলও চলল—কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় যে বিদ্রোহীদের দলে তারা অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবান্তর ও অন্ত্যজ।

শার্ট, পাঞ্জাবী, কোট, ব্লাউজ, শায়া মানুষের সমান হতে চায়; তাই বলে লংটি, কৌপীন, নামাবলীও তাদের সমান হতে চাইবে—এ তাদের অসহ্য! আমি বড়র সমান হবো—কিন্তু ছোট আমার সমান কেন হতে পারবে না—এখানেই তো সাম্যবাদের আসল রসটা!

মানুষেরা যে-যার ঘরে দুপুরবেলা পড়ে ঘুমোচ্ছিল, চীৎকার শুনে তারা জেগে জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখে—বাঃ বেড়ে মজা, কাপড়ের দল চলেছে, ভিতরে কোন মানুষ নেই, একেবারে অন্তঃসারশূন্য অবস্থা! এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর আগে কখনো দেখেনি!

কাপড়ের দল হাঁকছে—ভাই সব, তোমরা যে যেখানে আছ মানুষের সংস্পর্শ ছেড়ে চলে এসো—আজ আমরা বিদ্রোহ করে তবে ছাড়বো।

এই রব শোনবামাত্র মানুষের ঘরের বাক্সের, এমন কি গায়ের শার্ট, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, ধুতি ইত্যাদি লাফিয়ে লাফিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে সুরু করলো! মানুষ দেখে এ কি মুস্কিল—পাঞ্জাবী, শার্ট আপনি গা থেকে খসে উড়ে যাচ্ছে—এমন কি ধুতিখানারও সেই পথ! ফলে দাঁড়ালো এই যে মানুষের ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হল! কোন রকমে জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখে, কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে পলায়মান কাপড়খানাকে ধরতে চেষ্টা করে—কিন্তু তার বেশি আত্মপ্রকাশ করার সাহস কারো নেই!

মানুষের দুর্দ্দশা দেখে ভূতপূর্ব্ব বস্ত্রগুলোর সে কি হাসি!

কেউ বলে—কেমন, এখন তোমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়?

কেউ বলে—খুব যে দু'বেলা জলে ভিজিয়ে নিঙড়াতে, এখন লাগছে কেমন?

কেউ বলে—নিজের দোষে আমার গা ক্ষতবিক্ষত করে স্থচ দিয়ে শেলাই করে কি যন্ত্রণাই না দিয়েছ?

কেউ বলে—পারো তো সব ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরো—অমন করে অর্দ্ধ-প্রকাশিত হয়ে আছ কেন? তখন বস্ত্রের শোভাযাত্রার মধ্যে যেমন হাসি-

কৌতুকের ধুম পড়ে গেল, ঘরে ঘরে মানুষের বেছে অমে কেমনি আতঙ্ক ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব!

বিপ্লব আর কাকে বলে?

এই রকমে বিপ্লব সমাধা করে সেই বস্ত্রের শোভাযাত্রা প্রকাণ্ড এক মাঠে এসে সমবেত হল—সেখানে সভা হবে—আর বিপ্লবলব্ধ সম্পত্তির কালনেমির লঙ্কা ভাগ কাণ্ড হবে। বিপ্লবের সূচনায় শোভাযাত্রা আর অন্তে মহতী জনসভা! এবারে সেই বস্ত্রীয় জনতার মহতী সভা আরম্ভ হল।

হাওয়াই শার্ট সভাপতি হলেন। তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা উদ্গীরণ করলেন, তা লেখা বাহুল্য—কারণ পথেঘাটে তেমন বক্তৃতা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল মানুষের সংস্পর্শে থাকবার ফলে হাওয়াই শার্ট সে বক্তৃতা আয়ত্ত করে নিয়েছেন।

প্রথমে সভায় স্থির হল যে এবারে বস্ত্রের রাজত্ব সুরু হবে—স্বাধীনভাবে তারা জীবনযাত্রা আরম্ভ করবে—মানুষের কোন প্রভাব থাকবে না।

তারপরে কর্ম্মকর্ত্তা নির্দ্ধারণের পালা। এইখানেই বাধলো গোল।

সংসারে শার্ট কোট পাঞ্জাবী পায়জামা ব্লাউজ সেমিজের সংখ্যা কত? অধিকাংশই যে লেংটি, কৌপীন আর ছেঁড়া কাঁথা। এরা আর কোন গুণে না হোক, নিছক সংখ্যার গৌরবে সকলের চেয়ে বেশি! কাজেই ভোটের ব্যাপারে এদের ঠেকানো সম্ভব নয়।

শার্ট কোটের দল দেখল এ কি মুস্কিল! বিপ্লব করলাম আমরা! স্লোগান হাঁকলাম আমরা—আর কেবল হাতের জোরে অর্থাৎ হাতের সংখ্যার জোরে এরা সব কর্ম্মকর্ত্তা সাজবে! তবে এমন বিপ্লবে কি কাজ ছিল? এর চেয়ে যে মানুষের দাসত্বও ছিল ভালো—মানুষ আর যাই হোক, লেংটি, কৌপীনের চেয়ে অনেক বেশি অভিজাত! শার্ট কোটের দল যখন এই রকম চিন্তা করছে তখন লেংটি, কৌপীন, ছিন্ন কন্থারা এসে তাদের বিষম আক্রমণ করলো! উঃ সে কি ভয়াবহ যুদ্ধ!

প্রথমে শার্ট কোটেরা বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, ও হে ছিন্ন কন্থার দল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা বিপ্লব করলাম—আর এখন সেই উদ্দেশ্যেই দেশ শাসন করবো। বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ ছিন্ন কন্থার দল সে যুক্তি গ্রহণ করতে পারলো না। তখন লড়াই সুরু হল! কোথায় লাগে তার কাছে রুশ-জার্ম্মানীর যুদ্ধ! অবশ্য দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন এক রাশ

কাপড় মাঠের মধ্যে হাওয়ায় লুটোপাটি খাচ্ছে—কিন্তু আসলে তা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কত জামার যে হাতা ছিঁড়ে গেল, কত পায়জামার যে পা খ'সে গেল—কত ব্লাউজের যে বক্ষ বিদীর্ণ হল, তার লেখাজোখা নেই! মায়াবলী মশাই দূর থেকে সেই যুদ্ধ নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করলেন—অহো, কি ভয়ানক সংগ্রাম! যেন কুরু-পাণ্ডবের আহব!

ইতিমধ্যে রাত্রি এসে পড়ল। অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারের সুযোগে মানুষেরা ঘর ছেড়ে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে বালতি বালতি জল। তখন মানুষে সেই সংগ্রামরত বস্ত্র-জনতার গায়ে জল ঢালতে সুরু করে দিল! জল পড়লেই কাপড় কাবু! তারা ভিজে ন্যাকড়া হয়ে যায়—ভিজে বেড়ালটির মতো। শুষ্ক অবস্থার সে তেজ, সে চঞ্চলতা আর তাদের থাকে না।

হঠাৎ গায়ে জল এসে পড়ায় বস্ত্রের জনতা চীৎকার করে উঠল—এ কি! এ কে! কি সর্বনাশ! কিন্তু মানুষে কোন কথা বলে না—কেবল জল ঢালে! আর গায়ে জল লাগবামাত্র বীর পুরুষেরা ঝুপ ঝুপ করে ভেজা ন্যাকড়া হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, মানুষে অমনি তাকে তুলে ঝোলার মধ্যে ভ'রে ফেলে! এমনি জল ঢালা, আর ভেজা কাপড় সংগ্রহ করা চলল অনেকক্ষণ ধরে—ক্রমে সবগুলি কাপড়কে—হাওয়াই শার্ট থেকে আরম্ভ করে কৌপীন ও ছেঁড়া কাঁথা—সবগুলোকে মানুষে ঝোলায় ভ'রে ফেলল! আর রাত্রির অন্ধকার থাকতে থাকতেই বাড়ী ফিরে এসে সবগুলোকে রজক-সম্রাট্ রঘু ধোপার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল—বলে পাঠালো, এবারে সাবধানে একটু পাহারা দিয়ো।"

তার পরে মানুষেরা খবর পাঠালো নেয়ামৎ দর্জির কাছে—বলে পাঠালো অনেক সূঁচ সুতো যেন তৈরি রাখে, বিষম ঝড়ে কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছে—বেশ করে সেলাই করে দোরস্ত করে দিতে হবে!

পরদিন ভোরবেলা বিদ্রোহী বস্ত্ররা রঘু ধোপার ভাটিরূপ রৌরব নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধিমতো তাড়িত মর্দিত আলোড়িত হতে লাগলো। রঘু তার ছেলেমেয়েদের বলে দিল, এখানে সব বসে থাকবি, কাপড়গুলো আবার যেন ঝড়ে উড়ে না পালায়! ওদিকে নেয়ামৎ দর্জি সূঁচ-সুতো নিয়ে প্রস্তুত!

হাওয়াই শার্ট মনে মনে ভাবছে—objective condition প্রস্তুত না হতেই সুরু করে দিলাম!

পাজাবীটি ভাবছে—কেন মিছামিছি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম!

ব্লাউজটি ভাবছে—এখন কোন রকমে ফিরে গিয়ে সেই মেজগিন্নির আলমারিতে ঢুকতে পারলে হয়।

শেমিজ তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল—তা হবে না, দিদি, তোমার হাতটা ছিঁড়ে গিয়েছে—এবার ফিরে গিয়ে তোমাকে গিন্নির গায়ে আর উঠতে হবে না—ঝির মেয়ের গায়ে উঠবে!

ব্লাউজ ঝাঁঝালো স্বরে বললো—আচ্ছা! আচ্ছা! তোমাকে গিয়ে এবারে ঘর-মোছা ন্যাতা হতে হবে, দেখে নিয়ো!

লেংটি, কৌপীনের দল ভাবলো—আমাদের রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে!

নামাবলী মশাই ভাবলেন—অহো, প্রাণ যখন রক্ষা পেয়েছে, মানটাও অবশ্যই রক্ষা পাবে—

যেমনটি শুনেছি বলছি। কাউকে বিশ্বাস করতে বলি না, কারণ মানুষের বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। প্রথমটা আমি নিজেও বিশ্বাস করি নি, তারপরে যখন গল্প-বলিয়ে লোকটাকে বিশ্বাস হ'ল, তার গল্পটাতেও বিশ্বাস জন্মে গেল।

যার কাছে শুনেছিলাম, তার নাম অমলেন্দু। সে থাকতো মেসের ছোট একটা আধ-কামরা ঘরে, পড়ে কলেজে, বয়স এককুড়ি হয় নি, রঙটা স্নিগ্ধ কালো, কথা বলে কম, লোকের সঙ্গে মেলামেশা অল্প, অথচ ডেকে কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে। ইসারায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে সে সন্ত্রাসবাদী দলের লোক। মেসে কখন্ ফিরতো, কখন্ বেরিয়ে যেতো কেউ জানতো না, কেউ জানতে চাইতোও না, সকলেরই ওদের প্রতি একটা ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব ছিল। তখন ১৯৩২ সাল।

সেদিনও ছিল এমনি বর্ষার অন্ধকার সন্ধ্যা; সকাল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, শেষ হবার লক্ষণ নেই, বরঞ্চ বিকালের দিকে আরও চেপে এলো। ভিতরে বাইরে এমন অবস্থা যে ভালো-মন্দ ছোট-বড় কোন কাজে মন বসতে চায় না।

একে একে মেসের আট-দশটি প্রাণী আমরা ম্যানেজারের ঘরে এসে জুটেছি; খান-তিনেক তক্তপোষ জোড়া দেওয়া, শতরঞ্চির উপরে গোটা চার-পাঁচ বালিশ, সবাই কেমন যেন জবু-থবু হয়ে বসে আছি।

এমন কতক্ষণ ছিল জানি না, আমি যখন ঢুকলাম দোখ ভূতের গল্প চলছে। একে বর্ষার সন্ধ্যা, তার উপর ভূতের গল্প—মন্দ নয়, কিন্তু কোন গল্পেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচ নেই, সবই কেমন গতানুগতিক হাজারবার শোনা গল্পের ছাঁচে ঢালাই-করা। দুর্ভিক্ষের খাদ্য, এই মাত্র তার গুণ।

এক মুখ থেকে আর এক মুখে চলা গল্পের শৃঙ্খলে যখন কিছুকালের জন্ত ছেদ পড়েছে তখন শুনলাম,—'আমি একটা ঘটনা বলবো?'

সকলে তাকিয়ে দেখল—বক্তা অমলেন্দু।

সে যে এ হেন আড্ডায় যোগ দিতে পারে বর্ষা-সন্ধ্যা ছাড়া এমন অঘটন ঘটাতে আর কে পারতো?

সবাই সাগ্রহে বল্লাম, বলো, বলো! নিশ্চয় বলবে!

আমরা পরস্পরকে জানি কিনা, যতই সত্য ঘটনা বলি না কেন মনের মধ্যে অবিশ্বাস যেতে চায় না। ঐ সন্ত্রাসবাদীরা আর যাই করুক ওরা মিথ্যা কথা বলবে না, ভূতের গল্প জানবার খাতিরেও বলবে না, এ সবাই জানতাম। ওরা ভোর রাত্রে উঠে গীতাপাঠ করে।

অমলেন্দু স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠে অনাড়ম্বরভাবে আরম্ভ করলো—

গতবার ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি, তারিখটা বোধ করি ২২শে কি ২৩শে হবে। শেয়ালদায় গাড়িতে চাপলাম, বেলা সাড়ে চারটের সময়ে স্টেশনে নামবার কথা, শীতের দিনেও হাতে একঘণ্টা দিনের আলো থাকে। স্টেশন থেকে আমাদের গ্রাম এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু সেদিন এমনি বিপদ যে গাড়ির আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। স্টেশনে যখন নামলাম তখন আধ ঘণ্টার বেশি দিনের আলো আর নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, চাঁদ উঠবে অনেক বিলম্বে।

অমলেন্দু বলছে—স্টেশন থেকে গাঁয়ে যাবার দুটি পথ আছে,—একটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা শড়ক, আর একটা মেঠো পথ। শড়ক দিয়ে গেলে তিন মাইল, মাঠ ভেঙে গেলে দু'মাইলের বেশি নয়; শড়ক দিয়ে গেলে অন্ধকার হয়ে যাবে, মাঠ ভেঙে গেলে অন্ধকার হবার আগে পৌছলেও পৌছনো যেতে পারে। অন্ধকারে ভয় আর কিসের? শীতকালে মাঝে মাঝে গোবাঘা দেখা দেয় এই যা ভয়।

এখন শীতকালে অনায়াসে মাঠ ভেঙে যাওয়া যায়, ধান উঠে গেছে, পথও অনেকটা কম, কিন্তু—

এখানে অমলেন্দু থামলো, সবাই শুধালো—কিন্তু কি, বলো না, বলুন না!

—মাঠের পথে ভয়ের জনশ্রুতি ছিল।

—কি রকম ভয়?

—এই যা গল্প হচ্ছে। লোকে বলতো ঐ মাঠের মাঝে রাত-বিরেতে কত লোক নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। পারতপক্ষে এ পথ দিয়ে কেউ রাতের বেলা যেতো না, একলা তো নয়ই। আমি অবশ্য ওসব কথা বিশ্বাস করতাম না—

—এখন? এখন?

—সেই কথাই তো বলছি। খানিকটা দূর অবধি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধ'রে গিয়ে তবে মাঠের মধ্যে নামতে হয়, সেখানে তেমাথা এক খেজুর গাছ আছে। ভাবলাম এ পর্য্যন্ত তো এগোই, ওখানে অনেক সময়ে সঙ্গীর আশায় লোকে অপেক্ষা করে।

আমার ভাগ্য ভালো ছিল, ওখানে পৌঁছে দেখি একটি লোক সত্যিই অপেক্ষা করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, একজন মুসলমান চাষী। গোঁফ ছোট ক'রে ছাঁটা, দাড়ি ছুঁচলো, আর সর্ব্বাঙ্গে মাথায় একখানা চাদর জড়ানো, শুধু মুখটুকুই দেখা যাচ্ছিল।

—কি মিঞা কোথায় যাবে?

—নশরৎপুর। আপনি?

—তালপুকুর।

—তবে তো ঐ একই পথ, আমাকে ক্রোশটাক বেশি যেতে হবে।

—মাঠ দিয়ে যাবে না শড়ক দিয়ে?

—এতক্ষণ সঙ্গীর জন্মে অপেক্ষা করছিলাম, সঙ্গীই যখন জুটলো তখন আর শড়ক দিয়ে ঘুরে গিয়ে কি হবে?

—তবে চলো, মাঠেই নামি। তাছাড়া,—কি জানো মিঞা, আমরা ওসব ব্যাপারে মোটেই বিশ্বাস করি না।

—কি ব্যাপার, বাবু?

—ঐ যে ভূতপ্রেতের কথা—

—হুঁ।

—কত লোক নাকি রাত-বিরেতে দব্‌কে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—

—তাই নাকি?

ওই রকম কথা বল্‌তে বল্‌তে দু'জনে চলেছি, কথা আমিই বেশি বলছি, লোকটি বলছে কম, বোধ করি জনশ্রুতির পূর্ণ বিবরণ সে জানে না।

মাঠ প্রায় পার হয়ে এসেছি, এখানে কতকগুলা উজাড় ভিটা, বোধ

কারি এক সময়ে গাঁয়েরই অংশ ছিল, এখন কৌত হয়ে পড়ে আছে। লোকে হলুদের চাষ করে।

অদূরে গাঁয়ের সন্ধ্যাদীপ—চিনতে পারা যাচ্ছে কোন্ বাড়ির কোনটি। মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল, এতক্ষণ যে গুমোট ছিল তা কেটে গেল।

আমি বল্লাম, মিঞা, মাঠ পেরিয়ে এসেছি, আর ভয় নেই।

সেই কথা শুনে মিঞা আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—সে কী চোখ আর সে কী স্বর!

অমলেন্দু একটু থামলো, এতদিন পরেও সেদিনের স্মৃতি যেন তাকে ভীত ক'রে তুলেছে।

—সে চোখের দৃষ্টি যেন শ্মশানের নিভন্ত কাঠের আগুন, আর সে স্বর! তার সমান এতদিনেও মনে এলো না! তবে সে স্বরে জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক ওঠা-পড়া নেই।

সেই কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হ'ল—'বটে, মাঠ পেরিয়ে এসেছ, ভয় নেই? একবার আমার পায়ের দিকে তাকাও তো!'

অন্ধকারে তখন লোক দেখা যায় অথচ লোক চেনা যায় না! ঐ অমানুষী কণ্ঠস্বর আমার দৃষ্টি টেনে নামালো তার পায়ের দিকে—দেখলাম—

অমলেন্দু একবার থামলো, তার পরেই এক নিশ্বাসে বলে' ফেল্ল—হাঁটু থেকে নীচে অবধি পা দু'খানা মানুষের নয়, গোরুর!

যখন জ্ঞান হ'ল, দেখি বাড়িতে আমার শয়নঘরে শুয়ে আছি, পাশে মা এবং বোন!

জ্ঞান হয়েছে দেখে মা বল্লেন, তোকে কতবার না নিষেধ করেছি রাত-বিরেতে একলা ও পথে আসবি না!

বোন একটু ঠাট্টার সুরে বল্ল, এ তোমার পুলিশ নয় যে ফাঁকি দেবে, এ সব অপদেবতার ব্যাপার!

—কি ক'রে জানলে যে আমি ওখানে পড়ে আছি?

—আমরা এখানে জানালার ধারে বসে গল্প করছি, এমন সময় সমুখের ঐ পথ দিয়ে একজন পথিক যাচ্ছিল, বলে গেল 'তোমাদের কোন্ বাড়ির এক ছেলে বুঝি ঐ ভিটের উপর পড়ে আছে!'

মনে পড়ল গল্পে গল্পে বাড়ির পরিচয় মিঞাকে দিয়েছিলাম।

—তখন আমরা আলো নিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি—

বোন বল্‌ল, মূর্তিমান বীর, তুমি আবার ইংরেজ তাড়াবে! আচ্ছা দাদা, তোমাদের দলের সবারই এই রকম সাহস নাকি?

ওসব কথায় আমার কান ছিল না, শুধালাম, কি রকম তার চেহারা বল তো?

মা যে বর্ণনা দিলেন তা হুবহু মিশ্রার চেহারার সঙ্গে মিলে গেল!

—লোকটা কোন্ দিকে গেল?

—ঐ পথ দিয়ে সোজা উত্তরে গেল।

মাথাটা আবার ঘুরে উঠল, বেশ বুঝলাম চোখ স্তিমিত হয়ে আসছে।

বোন বল্‌ল -নাও, বীরপুরুষ আবার বুঝি মূর্চ্ছা যায়!

মা বল্‌লেন—তুই একটু থাম তো।

অমলেন্দুর গল্প শেষ হ'ল, সে থামলেও, অনেকক্ষণ আর কারো মুখে কথা ফুটলো না। সব কেমন এক নিস্তব্ধ ভাব, বাইরের অন্ধকার যেন কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।

ডাকিনী

আমি সরকারী এঞ্জিনিয়ার। পার্টিশনের পরে 'অপ্ট্' ক'রে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণতম এক জেলায় বদলি হয়েছি। সদরে এসে দেখি আমার সরকারী বাসনভবনটি মন্দ নয়। এঞ্জিনিয়ারের বাড়ি, এঞ্জিনিয়ারে তৈরী করেছে, কাকের মাংস কাকে খায় না, চুরি হয় নি।

এ জেলা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কখনো বেড়াতেও এদিকে আসিনি, মানুষ ও ভূপ্রকৃতি সবই নূতন ঠেকে। ভাবলাম হেড ক্লার্কের কাছে থেকে জেনে নেবো, এমন ক'রে জেনে নিয়েই তো অন্যান্য জেলায় কাজ চালিয়েছি।

অফিসে গিয়ে হেডক্লার্ক-বাবুকে সেলাম পাঠালাম, আর সেলামের উত্তরে যে-লোকটি প্রবেশ করলো, সে এক মূর্তি। মূর্তি আভূমি নত হয়ে নমস্কার করে যখন দাঁড়ালো তার সমস্ত কপাল রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, শিখায় জবাফুলের একটি কুঁড়ি আবদ্ধ, আর জামার তল থেকে গলার রুদ্রাক্ষের মালার গোটা-কয়েক রুদ্রাক্ষ রক্তবর্ণ চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

মূর্তি এবার কথা বলল—হুজুর, তান্ত্রিক, আমার পিতা তান্ত্রিক, পিতামহ তান্ত্রিক, সপ্তপুরুষ তান্ত্রিক, আমরা সাধকের বংশ।

—বসুন।

—হুজুরের সম্মুখে?

—ক্ষতি কি!

মূর্তি এবারে সবিনয়ে আসন গ্রহণ করল, বলল, অধমের নাম—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়, ঠাকুরের নাম—

—ঠাকুরের নাম থাক্। নিবাস?

—ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

—এখানে কতদিন?

—'অপ্ট' করেছি। হুজুরের শুভাগমনের তিন দিবস পূর্ব্বে। এখনো তেরাত্রি পূর্ণ হয় নাই।

—কতদিনের সার্ভিস?

—তেইশ বৎসর। এখনো সাত বৎসর তিন মাস বাকি! শোকে তাপে অকালে 'বার্দ্ধক্য' হয়ে পড়েছি, নতুবা আমার বয়স—

—বয়স থাক্।

আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সরকারী চাকুরিতে বয়স জিজ্ঞাসা করা সৌজন্যের পরিচয় নয়, কেননা, শোকে তাপে অকালে 'বার্দ্ধক্য' হয়ে পড়ায় সকলকেই বয়সের চেয়ে বুড়ো দেখায়, আসলে সকলেই 'তারুণ্য'।

তারপরে বললাম, ভেবেছিলাম আপনার কাছে থেকে এখানকার পথ-ঘাটের খবর নেবো, তা দেখছি আপনিও আমার মতন নূতন লোক।

—তাতে কি হয়েছে? যে খবর চাইবেন দেবো, যখন বলবেন আসবো, আমার মোকাম তো হুজুরের বাসস্থানের নিকটেই। কেবল বিহান বেলা আমার একটু বাধা—

—বাজারে যান বুঝি?

এবারে মূর্ত্তি ঈষৎ হাস্য ক'রে জানালো যে, না, ঠিক বাজারে যাওয়া নয়, বিহান বেলা ঘণ্টা-তিনেক তিনি কালীসাধনা করেন।

—কালী প্রতিষ্ঠা করেছি কিনা, একেবারে জাগ্রত কালী। অমাবস্যার দিন সারারাত্রি পূজা আর হোম হয়, একবার হুজুরের পদধূলা 'দিবার লাগবো।'—বলে লজ্জায় ও গৌরবে হাসলেন।

—আচ্ছা, এখন যান।

মূর্ত্তি বিদায় নিলো। বুঝলাম এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। আমার ভাগ্যে এখানে সকলই নূতন দেখতে পাচ্ছি।

এই ঘটনার তিন-চার দিন পরে একদিন দুপুরবেলা হেড ক্লার্ক মৃত্যুঞ্জয়বাবু জন-তিনেক লোক নিয়ে আমার কামরায় ঢুকলো।

—কি ব্যাপার?

—হুজুর, এঁরা বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান, আসছেন বামুনদাঁড়া গ্রাম থেকে।

—কি চান?

—সেখানে সরকারী রাস্তা তৈরী হচ্ছে, মাঝখানে একটা বিল্ববৃক্ষ পড়েছে, সেটা নিয়ে dispute দিতে এঁরা এসেছেন।

—কিসের dispute?

—সেটা কালীর থান।

এবারে বুঝলাম তান্ত্রিক সাধকবংশের আগ্রহের কারণ।

—সেটেলমেন্টের নক্সায় কি দেবস্থান ব'লে লিখিত আছে?

এবারে আগন্তুকদের একজন বল্‌ল—না, তা ঠিক লেখা নেই।

—তবে?

—সবাই কালীর থান ব'লে মানে।

আমি কিছু বিরক্ত হয়েই বললাম, এরকম হ'লে কাজ চলবে কি ক'রে? যখনই কোন কাজ করতে যাওয়া হয়, আমনি বের হয়, দেবতার স্থান, নয় পীরের কবর, হয় দেবত্র, নয় পীরত্র। এ তো ভারি মুস্কিল!

—হুজুর একবার নিজ চক্ষে দেখে আসুন।

—দেখে কি বুঝবো?

—কত লোকে মানে।

—সে তো যোগসাজসে অনায়াসে খাড়া করা যেতে পারে।

—খবর না দিয়ে চলুন, আজকেই চলুন।

—কি বলেন হেডক্লার্ক-বাবু?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আগন্তুকদের শুধালো—কখন্ ফিরতে পারবে?

—সন্ধ্যার মধ্যেই।

আমি বললাম—না হয় কিছু দেরীই হবে।

ঈষৎ ইতস্তত ক'রে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্‌ল—আজ যে অমাবস্যা, সারা রাত্রি হোম পূজা আছে।

—সে জন্য আপনি ভাববেন না। আপনার হোম পূজায় বাধা হবে না, মোটরে যাবো, মোটরে আসবো। যাতায়াতে কতক্ষণের পথ?

—আজ্ঞে তিন ঘণ্টার বেশি নয়।

—বেশ। কিন্তু একটা কথা। যদি কালীর থান ব'লে মনে না হয়, তবে তখনি লোক লাগিয়ে গাছ কাটিয়ে তবে ফিরবো। আপনাদের কথা মনে না ধরলে একেবারে গাছ কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে ফিরবো।

আগন্তুকরা বল্‌ল—হুজুর অবিচার করবেন না নিশ্চয় জানি।

তখনি বামুনদাঁড়া গ্রামের উদ্দেশে মোটরে রওনা হলাম, সঙ্গে হেডক্লার্ক-বাবু আর আগন্তুক কয়েকজন।

মোটর ছাড়লে ঘড়ি দেখলাম, বেলা দেড়টা।

যা পথ! শরীরের হাড়গোড়গুলো যে এখনো যথাস্থানে আছে তাতে

বুঝতে হবে শরীরের কারিগর বেশ নিপুণ। কেবলি ঝাঁকানি। আবার মাঝে মাঝে বালু—সেখানে গাড়ির চাকা এমন ব'সে যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার জোগাড়। চারদিকে অফুরন্ত মাঠ, ঝাউ আর নারকেল গাছই বেশি। বেলা তিনটায় সময় বামুনদাঁড়া গ্রামে পৌঁছলাম।

বল্লাম, কোথায় আপনাদের গাছ?

মোটর থেকে নেমে কিছুদূরে একটা গাছের কাছে এলাম। বিল্ববৃক্ষই বটে! আর পাঁচটা গাছের সঙ্গে প্রভেদ নেই। এই গাছের তলে বা উপরে কোথাও যে দেবতা ভর করেছেন এমন মনে হ'ল না। গাছটার নীচে অবশ্য চার পাঁচ টুকরো সিঁদুর মাখানো পাথর পড়ে ছিল, তা থেকে কি সিদ্ধান্ত করবো? আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সরকারী রাস্তা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে জমির মালিক প্রায়শ দেবতাকে 'রিকুইজিশন' ক'রে থাকে। যে-পথ দিয়ে এলাম সেটাকেই প্রশস্ত করবার কাজ চলছে, এখন ঠেকেছে এসে এই গাছটার সম্মুখে।

আমার মুখে অবিশ্বাসের ভাব দেখে আগন্তুকদের একজন বল্ল—হুজুর, বিশ্বাস না হয় গ্রামের প্রধানদের জিজ্ঞাসা করুন।

—জিজ্ঞাসা আর কি করবো, চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়া প্রধানরাই আপনাদের পাঠিয়েছিলেন।

—এখানে শিবরাত্রির দিনে মেলা হয়।

—মেলা ঐ পাশের মাঠটার উপরে করবেন, ওখানে স্থানাভাব হবে না।

তারপরে বল্লাম, গাছটাতে মা-কালী যে বেশিদিন ভর করেছেন তা মনে হয় না, একটা ঘর পর্য্যন্ত তোলবার সময় পান নি। না, এমনভাবে যত্রতত্র দেববৃক্ষ দেখা দিতে থাকলে কাজ চলবে কি ক'রে? পথ কি রকম দেখলেন তো? বর্ষাকালে বোধ করি সাঁতার-জল হয়। অসুবিধা তো আপনাদেরই, আমার কি?

—তা হোক, তা বলে কি দেবস্থান! তাকিয়ে দেখি একজন গ্রামবৃদ্ধ ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন।

তিনি বল্লেন, হুজুর, এ গাছ কাটলে গ্রামের অমঙ্গল হবে, শুধু তা-ই নয়, যিনি কাটবেন তাঁরও অমঙ্গল।

আর একজন বৃদ্ধ বল্লেন—এ গাছ কাটবামাত্র মায়ের লক্ষ ডাকিনী গ্রাম আক্রমণ করবে। এ আমরা সকলেই জানি।

তাঁরা কি ভাবে জানলেন সেকথা জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই, কারণ সাক্ষী-সাবুদের অভাব হবে না।

এবারে হেডক্লার্ক-বাবু সুরু করলেন—হুজুর কথাটা মিথ্যা নয়, আমাদের গ্রামের কাছে একবার এক কালীর থান অপবিত্র হয়, তার ফলে হুজুর, কি বলবো, এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, সে রাতে কি ঝড় আর বজ্রপাত, আর সেই সঙ্গে হাজার ডাকিনী যোগিনী।

—থামুন, ডাকিনী যোগিনীদের রূপকথা শুনবার সময় আমার নেই।

ওভারশিয়ারকে বল্লাম, আপনি লোক জোগাড় করুন, গাছ কাটতে হবে।

ওভারশিয়ার বল্ল—হিন্দুতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

—তবে সাঁওতাল দেখুন।

ওভারশিয়ার সাঁওতাল সংগ্রহের জন্য গ্রামের দিকে গেল। আমি কাছেই বসলাম।

লোকজনের মুখের অবস্থা দেখে মনে দুঃখ হচ্ছিল সত্য, কিন্তু এ রকম করলে কাজ চলে না। সরকারী কাজ, সাধারণের উপকারার্থ পথ-ঘাট তৈরি হবে, এ রকম ক্ষেত্রে দেবতাকে এনে হাজির করা যে দেবতার অপমান এ বোধ এদের নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওভারশিয়ার দু'জন সাঁওতাল মজুর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলো, তারা কুড়ুল নিয়ে তৈরী হ'য়ে এসেছে।

গাছ কাটতে লাগিয়ে দিলাম। গ্রামের লোকেরা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল, তখন নিশ্চয়ই তারা আমার দীর্ঘায়ু কামনা করছিল না। ওদিকে দেখি হেডক্লার্ক-বাবু শুষ্কমুখে নীরব ব'সে আছে, বোধ করি মনে মনে ইষ্টনাম জপছে।

ওভারশিয়ারকে বল্লাম, আপনি আজ রাত্রিটা এখানে থাকুন, কাল কাজ সেরে ফিরে যাবেন। যদি কেউ বাধা দেয়, পুলিশে খবর দিতে ভুলবেন না, আমরা এখন ফিরি।

এবারে মোটরে রইলাম আমি, হেডক্লার্ক-বাবু আর ড্রাইভারটি। বলে রাখি যে ড্রাইভারটিও এদেশে নূতন, আমার সঙ্গেই এসেছে।

তখন শীতের সন্ধ্যার ছ'টা, মানে বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। আমি

সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম—মৃত্যুঞ্জয়বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ফিরে গিয়ে পূজোয় বসতে পারবেন, অমাবস্যা লাগবে ন'টার সময়ে।

আমার আশ্বাসে তিনি যে সান্ত্বনা পেলেন মনে হ'ল না, চুপ ক'রে ব'সে থাকলেন। লোকটা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গেছে, গাছ কাটবার হুকুমে।

গাড়ি যথাসম্ভব দ্রুত চলছে, বেশ ঠাণ্ডা। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হেডক্লার্ক চীৎকার ক'রে উঠলেন—ঐ দেখুন হুজুর!

—কি?

—ঐ যে আকাশের কোলে মেঘ।

—মেঘ তো আকাশেই থাকে।

—শীতকালে থাকে না, তাছাড়া এ ঝড়ের মেঘ। আমাদের গাঁয়ের সেই গাছটা কাটবার পরেও এমনি মেঘ দেখা দিয়েছিল, সেটাও ছিল শীতকাল, হুজুর।

সত্যি, মেঘ ক্রমে আকাশ ছেয়ে ফেলতে আরম্ভ করলো আর মেঘের কোলে এখানে ওখানে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো।

—হুজুর, এ মায়ের ক্রোধ।

—আপনি চুপ করুন।

আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আর বিদ্যুতের মুহুর্মুহু ডালপালা ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে। মাঠে জনপ্রাণী নেই, গাছপালা ছবিতে আঁকা।

বাতাস বাড়তে আরম্ভ করলো, তারপরে বেশ জোরালো সব দমকা আসতে লাগলো, মোটরের গতি মন্থর হ'য়ে এসেছে।

এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ফাটিয়ে দিল। তারপরেই গর্জ্জন।

তারপরে সে কি মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-বিকাশ, অন্ধকারের কালো থানখানাকে বারম্বার সশব্দে টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল! একটা প্রচণ্ড দমকায় মোটরের কাপড়ের 'হুড' ছিঁড়ে উড়ে গেল—আর বিপদের উপর বিপদ, এঞ্জিন বারকয়েক গোঁ গোঁ করে বন্ধ হয়ে গেল, ড্রাইভারের কৌশল ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল। মোটর অচল হয়েছে।

—হেডক্লার্ক-বাবু?

উত্তর নাই, বোধ করি ইষ্টনাম জপছেন।

ড্রাইভার বলল—আপনারা নেমে এগোন, আমি দেখি কি করতে পারি।

—হেডক্লার্ক-বাবু!

—হুজুর, আমি আগেই বলেছিলাম।

—কি ?

—আজ আমার পুজোয় বসা হবে না।

—সে তো পরের কথা, এখন নামুন।

দু'জনে নেমে হাঁটতে সুরু করলাম।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মোটরের বাতি দেখা যাচ্ছিল, তারপরে সে আলোটুকুও অন্তর্হিত হ'ল? হয় বাতি নিভে গিয়েছে, নয় আমরা অজ্ঞাতে মোড় ফিরেছি।

—রাস্তা চিনতে পারছেন ?

—না হুজুর, আমি এদিকে কখনো আসিনি, আর এদেশেই বা কদিন!

—তবে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলুন।

এতক্ষণ বজ্র, বিদ্যুৎ এবং ঝড় ছিল, এবারে মুষলধারে জল নামল। দুজনে নীরবে চলেছি। বিদ্যুতের আঘাতে বজ্রের গর্জনে মনে হচ্ছে আকাশের চাতাল ফেটে গিয়েছে, পৃথিবী ঘোরতর অন্ধকার, গভীর জলের তলে বোধ করি এমনি নীরন্ধ্র তমোলোক, আর ঝড়ে জলে বজ্রে মিলে সে কি অবর্ণনীয় শব্দ, শব্দ নয় যেন কোন অতিকায় অলৌকিক সত্তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার!

—হুজুব শুনেছেন ?

—কি ?

—শব্দ।

—ওত ঝড়ের শব্দ।

—না, না হুজুর, মায়ের ডাকিনীর হুঙ্কার।

—আঃ এখন চুপ করুন।

একবার বিদ্যুৎ চমকাল।

—তাই তো, ও টিলাটা কোত্থেকে এলো? আসবার সময়ে তো দেখিনি! পথ ভুল করলাম নাকি ?

—ভুল করিনি হুজুর, ওঁরা পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

—কেন ?

কিন্তু সে উত্তর বোধ করি এমনি ভয়াবহ যে হেডক্লার্ক-বাবুর মুখে বেধে গেল।

কিন্তু বিপদ এই যে, একে শীতকাল, তাতে ঝড়-জল, গরম কাপড় সত্ত্বেও কাঁপছি। অবিলম্বে আশ্রয় না পেলে বিপদ ঘটবে। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরে আশ্রয়ই বা কোথায়? দুজনে মাথা নীচু করে মূঢ়ের মতো চলেছি। এমন সময়ে দক্ষিণ দিগন্তে একটা বিদ্যুতের অগ্নিময় শূল পৃথিবীর মর্ম্ম ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করল। হেডক্লার্ক-বাবু বললে বলতে পারতেন, হুজুর, আমাদের উদ্দেশে নন্দী ত্রিশূল নিক্ষেপ করল। সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, অদূরে একটা চালাঘর। দু'জনে ছুটে গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম, দরজা খোলাই ছিল। পরিত্যক্ত জীর্ণ ঘর, তবু ঘর তো বটে!

ঘরের মধ্যে যে কতক্ষণ আছি বুঝবার উপায় নাই। হাতের ঘড়ি দেখব কি ভাবে—ভিতরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। তাছাড়া বাইরের প্রলয়কাণ্ডে কালের ঊর্ণতন্তু কখন্ যেন উড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে, আমরা কালহীন মহা-সমুদ্রের উপরে বটপত্র মাত্র আশ্রয় করে ভাসছি। ঘরের চাল মুহুর্মুহু মচ্ মচ্ করে উঠছে, যে-কোন মুহূর্ত্তে উড়ে যেতে পারে। জীবনে অনেক ঝড় জল দেখেছি কিন্তু এমন দুর্দ্দম সজীব ব্যাপার দেখি নি। ওকি কেবল ঝড়ের গর্জ্জন? মনে হচ্ছে ধরিত্রীর নাভিকুহর থেকে এক সুগভীর আর্ত্তনাদ ধ্বনিত উত্থিত হচ্ছে!

—হেডক্লার্ক-বাবু!

সাড়া নাই। অনেক ঠাহর করে দেখলে অদূরে একটি পুঞ্জীভূত অন্ধকার দেখা যায়। ঐ উনি। নিঃশব্দে বসে আছেন, বোধ করি জপে বসেছেন। লোকটাকে দেখলে দুঃখ না হয়ে যায় না।

ঝড় একটু কমল। বললাম—হেডক্লার্ক-বাবু, ঝড় বোধ করি থামলো?

—না, হুজুর, এবারে ওঁরা আসবেন। এ রকম আমি আগেও দেখেছি। আগে আসে ঝড়, সেটা ওঁদের আগমনী, তারপরে ঝড় থামবামাত্র ওঁরা স্বয়ং আসেন। ঐ শুনেছেন শব্দ?

বাস্তবিক কেমন একরকম ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে বটে, এ তো ঝড়ের শব্দ নয়। তবে কি? সত্য কথা বলতে কি, এবারে আমিও একটু ভয় পেলাম। স্থান কাল বিবেচনা করলে এ ভয় অবাস্তব মনে হবে না।

আবার দ্বিগুণ বেগে ঝড় এল।

বোধ করি রাত্রি শেষ হবার মুখে। এমন সময়ে অতি প্রচণ্ড এক দমকায় ঘরের চাল সশব্দে ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেল—আর দরজার অর্গল ভেঙে বাহিরের অরাজক আব্‌হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—হুজুর, পালান, পালান, ওঁরা ঘরে ঢুকেছেন।

ধাবমান একটি পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল। বুঝলাম যে হেডক্লার্ক-বাবু বের হয়ে ছুটছেন। লোকটা মরবে নাকি? আমিও পিছন পিছন তাঁর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটলাম।

—থামুন থামুন, দেখুন ঝড় থেমেছে।

—ঝড় থেমেছে বটে, কিন্তু ঐ ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শুনুন, ওঁরা আসছেন।

সত্যই তো—এ কিসের গর্জ্জন? ঝড়ের হতে পারে না, ঐ প্রচণ্ড দমকার পরে ঝড় বেশ শান্ত হয়ে এসেছে। কোনো আদিম সত্তার অব্যক্ত ক্রুদ্ধ আক্রোশ যেন গর্জ্জনাকারে পুঞ্জীভূত হয়ে ঠেলে উঠেছে। ওডীসির একচক্ষু দস্যুটা শলাকা বিদ্ধ হবার সময় বোধ করি এইরকম ভয়াবহ হুঙ্কার করেছিল।

সম্মুখে অদূরে ধাবমান মৃত্যুঞ্জয়বাবু, পিছনে ধাবমান আমি!

মেঘ কেটে গিয়েছে, পূব দিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, এখন অনেকটা দৃষ্টি চলে।

—শুনুন ওঁদের গর্জ্জন!

—কিন্তু আপনি যে গর্জ্জনের দিকেই ছুটেছেন, থামুন, থামুন।

কে কার নিষেধ শোনে!

একজনের পিছনে অপর জন ধাবিত। কিন্তু কোন্ দিকে ছুটছি? গর্জ্জন যেন নিকটতর হচ্ছে! ডাকিনী? এও কি সম্ভব?

সম্মুখে কতকগুলি গাছপালা। তার মধ্যে হেডক্লার্ক-বাবু ঢুকে পড়লেন। আমিও ঢুকলাম। এমন সময়ে তিনি প্রকাণ্ড একটি হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলেন, আমিও পড়তে পড়তে কোন রকমে রক্ষা পেলাম।

ক্লান্ত হয়ে হেডক্লার্ক-বাবুর কাছে বসে পড়েছিলাম।

—ঐ, ঐ, শুনুন, ওরা—

মুখ তুলে সম্মুখে তাকালাম এবং গাছপালার অন্তরাল ভেদ করে দৃষ্টিপাত করলাম। এক মুহূর্ত্তেই গর্জ্জনের কারণ স্পষ্ট হয়ে গেল! ডাকিনীই বটে! সম্মুখে, অদূরে—সমুদ্র!

হেডক্লার্ক-বাবু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন।

কল্কি

তখন বিশ্বের সৃষ্টি হয় নাই। সে সময়ে আকাশ-সমুদ্র, ঊর্ধ্ব-অধঃ দশ-দিক এবং নবগ্রহ কিছুই ছিল না। তখন মরুৎগণ ছিল না, সরিৎগণ ছিল না, উদ্ভিদ ছিল না, প্রাণী ছিল না। উষা সন্ধ্যা তখন ছিল না, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না। যাহা কিছু এখন আমরা দেখি এবং যাহা কিছু এখন আমাদের চিন্তার বিষয়—সে সব কিছুই ছিল না; ছিল কেবল নিষ্কলঙ্ক শূন্যতা। একমাত্র শূন্যতা থাকার জন্য তাহাও ছিল না। সেই অসৎবৎ শূন্যতায় বিধাতা পুরুষ একাকী ছিলেন।

একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার বিরক্তিবোধ হইল। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে শুধাইল—প্রভু কি করিতে হইবে? বিধাতা বলিলেন—তুমি বিশ্ব সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বসৃষ্টিতে নিযুক্ত হইল। তখন দেখিতে দেখিতে নীল আকাশের চন্দ্রাতপে গ্রহ-সূর্য্যের দল সঞ্চরণ করিতে লাগিল, মরুৎগণ প্রবাহিত হইল, সরিৎগণ ধাবিত হইল, পাহাড়-পর্ব্বত সদ্যনিদ্রোত্থিতের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সমুদ্র দেখা দিল, উদ্ভিদ দেখা দিল, বিচিত্র-ধরণের প্রাণী দেখা দিল। উষার সঙ্গে আলো আসিল, সন্ধ্যার সঙ্গে আসিল অন্ধকার। বর্ষ-চক্রের আবর্ত্তনের প্রহরে প্রহরে ঋতুগণ আসিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিল—প্রভু একবার সৃষ্টি দেখুন।

বিধাতা বলিলেন—সুন্দর! কিন্তু কে এই সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে? ইহা ভোগ করিবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করো।

বিশ্বকর্ম্মা নরনারী দু-দলের সৃষ্টি করিল। আর তাহাদের বসবাসের জন্য স্বর্গের প্রান্তে নন্দনবন নামে সর্ব্বসুষমাভূষিত এক কানন সৃষ্টি হইল।

বিধাতার অনুজ্ঞা বহন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা তাহাদের বলিল—এই নন্দনবন তোমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্টি। তোমরা এখানে চিরকালের জন্য বাস করিবে। যাহা প্রয়োজন সমস্তই মিলিবে। কেবল বনের উত্তর দিক্‌টাতে

যাইবে না। এবং আমার ছাড়া আর কাহারও কথায় কান দিও না। যাও, এখন তোমাদের নূতন আবাস একবার ঘুরিয়া দেখ। এই বলিয়া বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

নর নারী নন্দনবন ঘুরিয়া দেখিবার জন্ম বাহির হইল। চারিদিকে সবুজ গাছ; গাছের শাখায় শাখায় ফুল আর ফল। মাঝখান দিয়া ছোট একটি নদী প্রবাহিত। নদীর ধারে ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহা।

আরও কিছুদূর গিয়া তাহারা দেখিতে পাইল একটি সরোবর। তরল পান্নার মতো তাহার জল। জলে অসংখ্য পদ্ম। বাতাস বহিলে পদ্মে, পদ্মপাতায় আর জলে মাতামাতি লাগিয়া যায়। তাহারা উপরে চাহিয়া দেখিল নীল আকাশ। আকাশের গায়ে হাঁসের পালকের মতো লঘু মেঘের খণ্ড। এত সৌন্দর্য্য তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া ফেরে—কেবল উত্তর দিক্‌টাতে যায় না।

একদিন দুপুরবেলা পুরুষটি যখন নিদ্রিত, নারী একাকী নন্দন ভ্রমণে চলিল। হঠাৎ মনে হইল কে যেন তাহার কানে কানে বলিতেছে—একবার উত্তর দিকে চলো না। সে চমকিয়া উঠিল! কে এমন কথা বলে? তাহারা ছাড়া এ বনে তো আর কেউ নাই। সে ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিল। পুরুষটি শুধাইল, উত্তর দিকে যাওনি তো? নারী বলিল—না। অপরিচিত কণ্ঠস্বরের কথা সে চাপিয়া গেল।

কৌতূহল নারী-চরিত্রের ধর্ম। সে আবার পরদিন মধ্যাহ্নে একাকী বাহির হইল। আবার সেই কণ্ঠস্বর। "উত্তর দিকটা দেখিলে দোষ কি? সেদিকটা এদিকের চেয়েও সুন্দর।" নারী ভয় পাইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু প্রত্যেকদিন একই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে তাহার ভয় অনেকটা ভাঙিয়া গেল—সে সাহসে বুক বাঁধিয়া একাকী একদিন উত্তর দিকে চলিল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল—সাহস দিতে দিতে, বাহবা দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রমণী দেখিল—সত্যই উত্তর দিকটা অন্য সব দিকের চেয়ে সুন্দরতর। এত রঙ্, এত গান, এত গন্ধ অন্যদিকে সে কি দেখিয়াছে! কিন্তু সব চেয়ে তাহার কাছে যাহা বিস্ময়জনক লাগিল, তাহা একটি অদ্ভুতদর্শন কালো

বস্তু। বৃহদাকার নল ও চক্র সমন্বিত একটি কালোপদার্থ অনেকটা জায়গা জুড়িয়া দণ্ডায়মান।

অদৃশ্য-ব্যক্তির কণ্ঠস্বর তাহাকে যেন উৎসাহ দিবার জন্যই বলিল—বাঃ কি সুন্দর! আরও একটু কাছে যাওনা।

কিন্তু অপরিচিত বস্তুর কাছে যাইবার সাহস তাহার হইল না। সে ভয় পাইয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিল। দ্রুত ফিরিয়া আসিল কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া স্বভাবজ কৌতূহল তাহাকে খোঁচাইতে লাগিল। একবার দেখিলে এমন কি দোষ হইত!

পরদিন আবার সে সেই বস্তুটির কাছে গেল। কণ্ঠস্বর বলিল—একবার স্পর্শ করিয়া দেখো না। কিন্তু নারী আর অগ্রসর হইল না। এইরকম করিয়া দিনের পর দিন তাহার কৌতূহল ও ধৈর্য্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। পুরুষটি ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। সে দুপুরবেলা পড়িয়া ঘুমায়—এসব জানিবার তাহার সময় কোথায়?

অবশেষে রমণীচরিত্রের কৌতূহলেরই জয় হইল। সে স্থির করিল—একবার বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে। স্পর্শ করিতে এমন কি দোষ!

সেদিন দুপুরবেলা সেই কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করিয়া সে বস্তুটির কাছে গেল এবং তাহার উৎসাহবাক্যে সাহস সঞ্চয় করিয়া বস্তুটিকে আল্‌গোছে একবার স্পর্শ করিল। অমনি সেই কালো বস্তু যেন সজীব হইয়া উঠিল। চাকা ঘুরিয়া উঠিল, নল হইতে ধোঁয়া ও আগুন স্ফুরিত হইতে লাগিল—আর সে কি বিষম গর্জ্জন? সে ভীত হইয়া এক দৌড়ে পালাইয়া চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে শুনিল—যেন অদৃশ্য কোন ব্যক্তির হাসি তুষারকণার মতো চারিদিকে বিকীরিত হইতেছে। পুরুষটিকে কিছুই জানাইল না।

এদিকে বৈকুণ্ঠে বিধাতার আসন টলিয়া উঠিল। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন—একবার নন্দনে যাও তো। নরনারী যদি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তবে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ভুলিও না।

বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া নরনারীকে বলিল—তোমরা বিধাতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ। উত্তরদিকের সেই কালোবস্তুটিকে তোমরা স্পর্শ করিয়াছ।

পুরুষ বলিল—না। নারী নীরব হইয়া রহিল।

সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুরুষ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে রাক্ষসী—তুই কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস। তারপরে সে বিশ্বকর্ম্মার পায়ের উপর গিয়া পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিল—বিধাতার ক্ষমার নাম প্রায়শ্চিত্ত। তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমাদের নন্দন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

—কোথায় ?

—পৃথিবীতে।

পুরুষটি বলিল—পৃথিবী ! সে আবার কি ? সে কোথায় ?

বিশ্বকর্ম্মা নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন—ওই যে ক্ষুদ্র মৃৎকণা—ওটাই পৃথিবী।

পুরুষ ব্যাকুলভাবে বলিল—ওখানে গিয়া কি করিব ?

—প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

—কেমনভাবে তাহা করিতে হইবে ?

বিশ্বকর্ম্মা বলিল—জরা মৃত্যুর অধীন হইয়া, রোগ শোক আধিব্যাধির অধীন হইয়া, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের ক্রীতদাসরূপে পরিশ্রম করিয়া এই পাপ ক্ষালন করিতে হইবে।

—কতদিন লাগিবে ?

—কোটি কোটি বৎসর, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্মজন্মান্তর গ্রহণ।

পুরুষটি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। নারী চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।

—আর—এখানে ফিরিতে পাইব না ?

বিশ্বকর্ম্মা বলিল—না।

পুরুষটি যেন আপনমনেই বলিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ।

বিশ্বকর্ম্মা সান্ত্বনার সুরে বলিল—এখানে ফিরিতে পাইবে না বটে, তবে পৃথিবীই নন্দনে পরিণত হইবে।

পুরুষ সাগ্রহে শুধাইল—কবে ?

—যে অপরাধ করিয়াছ তাহার মাত্রা ক্ষয় হইলেই।

—কেমন করিয়া জানিতে পারিব যে অপরাধের ক্ষয় হইল ?

বিশ্বকর্মা বলিল—অপরাধের মাত্রা যখন পূর্ণ হইবে, তখনি বুঝিবে যে এবারে মহাপুরুষের আবির্ভূত হইবার লগ্ন সমুপস্থিত। নিশান্তের অন্ধকারতম ক্ষণেই তো সূর্যোদয় হইয়া থাকে।

—সেই মহাপুরুষের কি নাম?

—নামের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিবার আশা করিও না। কিন্তু যদি নিতান্তই নাম চাও, তবে শোন তাঁহার নাম—কল্কি।

এই বলিয়া বিশ্বকর্মা বলিল—এখন তোমরা বিদায় হইবার জন্য প্রস্তুত হও।

নরনারী প্রস্তুত হইতে লাগিল—বিশ্বকর্মা প্রস্থান করিল।

যখন দুইজনে নন্দনের বাহিরে আসিয়াছে তখন এক ব্যক্তি তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পিছনে চক্রচালিত সেই কালোবস্তুটি।

নারী চমকিয়া উঠিল।

পুরুষ শুধাইল—ব্যাপার কি?

সেই লোকটি বলিল—এই বস্তুটি স্পর্শ করিবার দোষেই তোমাদের নির্বাসন। এটাকে ছাড়িয়া কেন যাও? এটাকে পৃথিবীতে লইয়া যাও। ওই যে শুনিলে পৃথিবী নন্দনে পরিণত হইবে—তাহা এই বস্তুটির কৃপাতেই।

পুরুষ বলিল—ইহার কৃপায় কি পাইব?

সেই ব্যক্তি বলিল—অনন্ত ঐশ্বর্য, কল্পনাতীত সুখ।

—শান্তি পাইব কি?

—না।

—তবে চাই না। .

সেই ব্যক্তি বলিল—তোমাদের জন্য না চাও, তোমাদের পুত্র-পৌত্রের জন্যও কি চাও না?

পুরুষ নীরব। রমণী বলিল—চাই।

সেই ব্যক্তি উৎসাহ দিয়া বলিল—এইতো নারীর মতো কথা। এই বস্তুটির গুণের অন্ত নাই। ইহার গুণে তোমরা এমনি ক্ষমতাবান হইবে যে বিধাতাকে আর প্রয়োজন হইবে না। নিজেরাই নিজের বিধাতা হইতে পারিবে।

পুরুষ শুধাইল—বস্তুটির কি নাম ?

সেই ব্যক্তি বলিল—যন্ত্র।

—তোমার কি নাম ?

সে ব্যক্তি বলিল—শয়তান

এই বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। নর-নারী, সেই আদি-দম্পতি সেই যন্ত্রটিকে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করিল।

বাঁশ ও কঞ্চি

জীর্ণ পৈতৃক তক্তপোষখানি মচ্‌মচ করিয়া উঠিল, তবে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল না, সেকালের জিনিষ কিনা। অনেকদিন ভাবিয়াছি তক্তপোষখানা বাতিল করিয়া ফেলিয়া দিব, ভাগ্যে দিই নাই, তাই আজ আমার ইজ্জৎ রক্ষা করিল, হাজার হোক পৈতৃক বস্তুর দরটাই আলাদা। বারকতক হেলিয়া দুলিয়া তক্তপোষ ক্ষান্ত হইল, ইতিমধ্যে আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভাবাবেগে, আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় হেলিতে দুলিতে লাগিয়া গিয়াছি।

আসুন, আসুন, আজ আমার কি সৌভাগ্য, এ যে গরীবের ঘরে হাতীর পায়ের চিহ্ন, প্রভৃতি যে-সব শুভ স্বাগত বাক্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম সে-সব বলিতে বলিতে মুখে, চোখে, হস্তদ্বয়ে তদুপযুক্ত ভঙ্গী ও ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

অপর পক্ষ যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পৈতৃক তক্তপোষের মজ্জার পরীক্ষা হইয়া গেল তিনি বলিলেন, সে কি কথা, আপনার মতো গুণী প্রতিবেশীর বাড়ীতে আসা এতো আমার কর্ত্তব্য। এতদিন যে আসিনি অন্যায় হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া জানেন তো কিছুদিন থেকে বড় ব্যস্ত ছিলাম।

ওরে, ও রামা, বলিয়া নিরুদ্দিষ্ট ভৃত্যের উদ্দেশ্যে অনির্দ্দিষ্ট কারণে একটা হাঁক ছাড়িলাম।

তিনি কিছু অনুমান করিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, না, না, প্রয়োজন হবেনা, আমার সঙ্গে সিগারেট আছে।

পকেট হইতে রূপার সিগারেটকেস বাহির হইল, সিগারেটকেস হইতে যুগল সিগারেট বাহির হইল, এখনি সিগারেট হইতে ধোঁয়া বাহির হইবে।

আসুন একটা নিন।

কি সর্ব্বনাশ! একে তো সিগারেট খাইনা, তারপরে তাঁহার কাছে, মুখখোলা পেট্রল পাম্পের কাছে বরঞ্চ সিগারেট খাইতে রাজি আছি।

নাক মুখ যোগে প্রচুর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি সুরু করিলেন,

নাঃ, বেশিদিন আর এসব খাওয়া চলবে না, সেই পুরানো খেলো হুঁকোয় ফিরে যেতে হবে দেখছি।

এ রকম ভয়াবহ আশঙ্কার স্থলে কি বলা উচিত জানি না, মুখের ভাবেও অনেক কিছু প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু সে বিষয়েও শিক্ষা নাই, তাই শোকাচ্ছন্নভাবে চুপ করিয়া থাকিলাম।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, শয়তান মশায়, শয়তান, সরকার নয়। নইলে এরকমটি কেউ করে, চৌদ্দপুরুষের জমিদারী কেড়ে নেয়। দেখবেন আসছে ইলেকশানে একটি ভোট পাবে না।

আরো অনেক কিছু বলিলেন, আইনে রাজদ্রোহ অপরাধ নাই বটে, তবে সমাজে ভদ্রতাগুণ তো এখনো আছে শুনিতে পাই, কাজেই সে-সব আর প্রকাশ করিলাম না।

পাঠক এবারে নিশ্চয় ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রসঙ্গটা সরকার কর্তৃক জমিদারী প্রথা লোপ। কিন্তু বক্তা কে? জমিদার স্বয়ং? এবারে পাঠকের ভুল হইল। জমিদার নয়, জমিদারের নায়েব।

তারাচরণবাবু আমাদের গ্রামের জমিদারের নায়েব। গ্রামের মধ্যে তিনি একাই আছেন, আর সকলে না থাকিবার মধ্যেই, আর সবচেয়ে কম করিয়া আছেন জমিদার স্বয়ং। তাঁহাকে কালে ভদ্রে দেখিতে পাই, শুনি কলিকাতায় না কোথায় থাকেন। জমিদারের কাছারী বাড়ীতে তারাচরণবাবু সপরিবারে এবং পরিবারের ভ্রাতা ভগ্নী মাতাপিতাগণ সহ দেদীপ্যমান আর জমিদারের বসত বাড়ীটিতে ছুঁচো ইঁদুর চামচিকা বাদুড় প্রভৃতি জীব বিদ্যমান। তারাচরণবাবুর ফিটন গাড়ী সদর্পে গ্রাম্যপথে চলাফেরা করে। তারাচরণবাবুর পাইক বরকন্দাজের হাঁকডাকে গ্রাম্য বায়ুমণ্ডল শব্দিত। কাজেই আনাড়ীর যদি ধারণা জন্মে যে কার্য্যতঃ তিনিই জমিদার তবে তাহাকে অজ্ঞ বলা যায় না। বলা বাহুল্য তারাচরণবাবু গ্রামস্থ কাহারো বাড়ীতে কখনো পদার্পণ করেন না, তাঁহার বাড়ীতেই গ্রাম সকাল-সন্ধ্যায় গমন করিয়া থাকে।

এ হেন তারাচরণ বাবু গ্রাম্য ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের বাড়ীতে অযাচিতভাবে আসিলে কি বলিব? কলির সন্ধ্যা না সত্যযুগের ঊষা? মুখে যাহাই বলি না কেন, মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম সরকার জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দিয়া সত্য একটা 'বৈপ্লবিক' কার্য্য করিয়াছে নতুবা গ্রাম্য

স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের বাড়ীতে তারাচরণ বাবুর আগমনরূপ বিপ্লব কিরূপে সম্ভব হয়!

দেখবেন, আমি ছাড়ছি না, হাইকোর্ট মামলা করে গভর্ণমেণ্টের অর্ডার stay করিয়ে দেবো, তারপরে ধীরে সুস্থে প্যাঁচের পর প্যাঁচ কষে—হুঁ দেখে নেবেন।

তারাচরণ বাবুর প্যাঁচ বলিতে যে কি বোঝায় গ্রামস্থ একজনরূপে তাহা আমার সম্যক জানিবার কথা, তাই তিনি বাক্যটি আর শেষ করিলেন না।

এই ভাবে ঘণ্টা দুই তিন আমার বাড়ীতে বসিয়া সরকারের শয়তানি, মানুষের কৃতঘ্নতা, বিষয়আশয়ের অকিঞ্চিৎকরতা, নিজের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির ব্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে এত সহজে পৈতৃক জমিদারী (কাহার?) তিনি হাতছাড়া যদি করেন তবে তিনি পিতার সুপুত্র নন।

তারপরে পুনরায় মদীয় পৈতৃক তক্তপোষখানি বিচলিত করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং ফিটনে আরোহণ করিয়া পৈতৃক জমিদারীব পৈতৃক কাছারী বাড়ী (কাহাব?) অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। কালের পরিবর্ত্তনে আমি হতবুদ্ধি হইয়া নিতান্ত অভিভূতের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু এদিনের এইটিই শেষ বিস্ময় নয়। আরো ছিল। কিছুক্ষণ পরে রমেশবাবু সচকিতভাবে আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

আসুন, আসুন, জমিদারবাবু যে।

আরে চুপ, চুপ, ও বেটা আবার জানতে পাবে।

কার কথা বলছেন?

ঐ বেটা তারাচরণ।

আজ্ঞে তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গিয়েছেন।

কেন শুয়োরটা এখানে এসেছিল নাকি?

এসেছিলেন বৈকি!

তবেই বুঝুন, সরকার একটা ভালো কাজ করেছে, নইলে তারাচরণ আসবে আপনার বাড়ীতে।

আমিও তাই ভাবি।

ভাবেন তো। চলুন ভিতরে গিয়ে বসিগে। কোথায় যাই, কার সঙ্গে কথা বলি, গোপনে লোক পাঠিয়ে খবর নেয়। মজা দেখুন, আমার নিজের গ্রামে, নিজের জমিদারীতে আমাকে পর করে তুলেছে, বেটা এমন বজ্জাত।

পাঠক, এবারে নিশ্চয় বক্তা ও বক্তব্য যুগপৎ বুঝিতে পারিয়াছেন। গ্রামের জমিদার রমেশবাবুর সঙ্গে এখন আমি কথা বলিতেছি।

আপনি কবে এলেন?

আজ সকালে।

আসবার কথা তো শুনিনি, হঠাৎ!

জমিদারী বাজেয়াপ্ত হতে চলেছে কিনা—

বড়ই দুঃখের বিষয়।

সেই কথা বজ্জাতটা বুঝিয়েছে নাকি? মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। জমিদারী থেকে যা পাই তাতে একমাসও চলে না, কল্‌কাতায় চাকরি করে খাই, পাছে কখনো জমিদারী থেকে বেশি কিছু চেয়ে বসি তাই বেটা মাসে তিনবার ক'রে অজন্মা, বন্যা, সদর খাজনার দায় শুনিয়ে থাকে। ভয়ে চুপ করে থাকি। জমিদারীটুকু নিলে বেঁচে যাই, ওসব দায় আর থাকে না। মাঝে থেকে যা পাই তাই খুব।

আমার তো অন্য রকম ধারণা ছিল।

আপনি তো জমিদার নন বুঝবেন কি ক'রে? আমার মতো মনোভাব শতকরা নব্বই জন জমিদারের।

কিন্তু তারাচরণবাবু খুব দুঃখিত।

তারাচরণের মতো মনোভাব শতকরা নব্বই জন নায়েবের, ওরাই তো মালিক, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, তোফা সম্পত্তি ভোগ করছে মশায়। সম্পত্তি গেলে আমার, থাকলে ওর। এ রকম ক্ষেত্রে জমিদারী গেলে ওর দুঃখ না হ'য়ে যায় না।

উনি তো বলছিলেন যে হাইকোর্টে মামলা ক'রে নাকি অর্ডার stay করাবেন।

সেই আভাস পেয়েই তো হঠাৎ আসতে হ'ল।

কেন?

মামলায় আমার কি লাভ? stay হ'লে ওবেটা আরো কিছুদিন সম্পত্তি

ভোগ করবে, stay না হ'লে খরচার দায়ী হব আমি। এ রকম ক্ষেত্রে আমার কি লাভ?

কিন্তু উনি তো বলছিলেন যে সহজে ছাড়বেন না।

আর সেই জন্যেই তো আসা। সম্পত্তির মূল দলিলগুলো আজ রাত্রে চুরি ক'রে নিয়ে স'রে পড়বো। তারপরে দেখি বেটা কি ক'রে মামলা দায়ের করে।

নিজের জিনিষ নিজে চুরি করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই, জমিদার ও নায়েবের মধ্যে কি বিশ্বাসের সম্বন্ধ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের কথা যখন পাড়িতেছি, রমেশবাবু বলিয়া উঠিলেন কথাটা হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমি ফাঁস ক'রে দিয়ো না।

না, না, সে ভয় করবেন না।

ভয় কেন করবো? তুমি যে শিক্ষক!

হায় শিক্ষক যে নির্ব্বোধ, এ কথাটা ঘরে পরে জানিতে কাহারো বাকি নাই। তাই সকল পক্ষই আসিয়া তাহাকে গোপন কথা অসঙ্কোচে বলিয়া যায়।

নাও, কথায় কথায় অনেক রাত হ'ল, এবারে উঠি। আজ রাতেই কাজটা সেরে শেষ রাতের ট্রেণে ফিরে যাবো।

যেমন সচকিতভাবে আসিয়াছিলেন তেমনি সচকিতভাবে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আমি একাকী বসিয়া বসিয়া জমিদারী সম্বন্ধে জমিদার ও নায়েবের বিচিত্র মনোভাব প্রসঙ্গ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

কুকুর বিড়ালের কাণ্ড

অজিত কুকুর ছানাটি কোলে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র একটি বিচিত্র ফ্যাঁশ শব্দে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল ও আবার কি ?

সঙ্গে ছিল দিলীপ সে বলিল, তোমার বাড়িতে বেড়াল আছে নাকি ?

আছে বই কি, ফেনী, এ বাড়ির একমাত্র মালিক, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে ?

শব্দে !

ও তো ফেনীর আওয়াজ নয়, বর্ষার দিন সাপ খোপ হ'তে পারে।

সাপ নয়, তবে সাপের মতোই হিংস্র হ'য়ে উঠেছে।

আবার ফ্যাঁশ আওয়াজ হইল, এবারে আরও বিকট।

ঐ শোনো।

দিলীপ সাবধান, নিশ্চয় সাপ।

নিশ্চয় তোমার ফেনী, ঐ দেখো।

তখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া উভয়ে একযোগে দেখিল শ্রীমতী ফেনী বাড়ির একমাত্র মালিকা—রান্নাঘরের দরজায় উদ্যত-লম্ফভাবে দণ্ডায়মান, তাহার চোখ দুটা প্রজ্বলিত, পরিদৃশ্যমান দন্তপংক্তির ভিতরে জিহ্বা সঙ্কুচিত।

ঐ দেখো, এবার তো বিশ্বাস হ'ল যে সাপ নয়, কিন্তু হিংসায় এখন ও সাপের চেয়ে কম নয়।

হঠাৎ এমন হবার মানে ?

মানে তো স্পষ্ট। ওর নিঃসপত্ন অধিকার ভঙ্গ হ'বার উপক্রম, কোলে ককার স্প্যানিয়েলের বাচ্ছা।

পশুর মনস্তত্ত্ব বুঝলে কি উপায়ে ?

মানুষের মনস্তত্ত্ববোধের দ্বারা। তা ছাড়া এটার মা-কে যেদিন কিনে এনেছিলাম আমার বাড়ীর বেড়ালটাও ঠিক এমনি করেছিল।

আশ্চর্য্য !

কিছুই আশ্চর্য্য নয়, মানুষেও ঠিক এমনিটি করে থাকে। বাড়ীতে

নূতন চাকর এলে, অফিসে নূতন কেরাণী এলে পুরানোরা এমনি ক'রে থাকে।

এমন বিকট আওয়াজ করে না নিশ্চয়।

আওয়াজে কি আসে যায়, মনোভাব তোমার ফেনীর মতোই হয়ে থাকে।

অজিতের স্ত্রী সুরমা বৈকালিক প্রসাধনরূপ গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল, কুকুর ছানাটি দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এই যে এনেছ, বাঃ কি সুন্দর!

তারপরে কুকুর ছানাটি কোলে লইল।

অজিত বলিল, দিলীপকে একটা নমস্কার করো, দাতাকে একবার ধন্যবাদ দাও। কিছুই করলে না, বেশ লোক তো।

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া কুকুর ছানাটি নাকের কাছে তুলিয়া সুরমা বলিল, নমস্কার দিলীপবাবু, সরি, আমি দেখতে পাইনি।

দুঃখিত হবেন না বৌদি, আমার মতো সামান্য লোক ওর আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে তো যাবেই।

ঠাট্টা করবেন না দিলীপবাবু।

ঠাট্টা নয় বৌদি। ওর পেডিগ্রি জানলে আমাদের মানুষ বলেই মনে হবে না। ওর পূর্ব্বপুরুষদের একটা শাখা গিয়েছে জার্ম্মাণ কাইজারের কুকুরশালায় আর একটা শাখা গিয়েছে হোলি রোমান এম্পারারদের কুকুরশালায়। এ দুটো আমাদের দেশের চন্দ্র সূর্য্য বংশের অনুরূপ। তাই ওর আলোর উল্লেখ করেছিলাম।

তিনজনের কথোপকথনের মধ্যে উক্ত চন্দ্র সূর্য্য বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি নিতান্ত সুবোধ শিশুটির মতো সুরমার কোমল কোলটি জুড়িয়া পড়িয়া রহিল, কেবল কালো কালো দুটি চোখে দুটি কৌতূহল কণা জ্বলিতে থাকিল।

ফেনীর অবস্থা সত্যই দারুণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বাড়ীর আদরের ও দুধ-মাছের ভাগীদারকে প্রভুর কোলে দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এখন তাহাকে প্রভু-পত্নীর কোলে স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; বুঝিল প্রতিকারের উপায় নাই, তাই সে নিষ্ফল আক্রোশে গোঁ গোঁ শব্দে গজরাইতে লাগিল।

একে দু'বেলা মাংস খাওয়াতে হবে।

তা হলে ওকে মেরে ফেলবেন বৌদি।

তবে কি খাবে?

দু'বেলা আট আউন্স করে দুধ, সপ্তাহে দু'দিন মাংস, তাও এক ছটাকের বেশী নয়।

আমি ভেবেছিলাম রোজ মাংস দিতে হবে।

না, না, একি শিকারী কুত্তা না এলসেশিয়ান? তা ছাড়া কেবল এক মাসের বাচ্ছা কিনা।

দাঁড়ান ওর ডায়েটিংটা লিখে নেবো। কিন্তু তার আগে আপনাদের চা ক'রে দিই।

তা দিন, কিন্তু ওকে চা খাওয়াবেন না ব'লে রাখছি।

কুকুর ছানাটিকে একটি জল-চৌকির উপরে স্থাপন করিয়া সুরমা রান্না-ঘরে প্রস্থান করিল, অজিত ও দিলীপ ঘরে গিয়া বসিল।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ পাইয়া তিনজনে ছুটিয়া বাহির হইল, বাহির হইয়া দেখিল ফেনী চামুণ্ডা মূর্তি ধরিয়া জল-চৌকিতে উঠিয়া কুকুর ছানাটিকে নখদন্ত যোগে আক্রমণ করিতে উদ্যত আর কুকুর ছানাটি অসহায়ভাবে পড়িয়া আছে।

তবে রে পোড়ারমুখী, বলিয়া সুরমা ফেনীর ঘাড়ে লাঠির ঘা বসাইয়া দিল। প্রহৃত, অপমানিত, ফেনী সুকরুণ মিও মিও শব্দ করিতে করিতে কয়লা গাদার দিকে প্রস্থান করিল। যার যেথা স্থান।

এ তোমার অন্যায় সুরমা।

কি অন্যায়টা শুনি, ঐ শাঁকচুন্নি আমার কুকুর ছানার গায়ে হাত দেবে?

কিন্তু এতদিন তো ওরই ছিল আদর।

যখন ছিল তখন ছিল, বলিয়া এবারে কুকুর ছানাটিকে লইয়া রান্না-ঘরে চলিয়া গেল।

দেখবেন বৌদি ওকে আবার এক কাপ চা খাইয়ে বসবেন না।

অবশেষে তিনটি চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া কুকুর ছানার নামকরণ হইল "কালো জোনাক"। চোখের দীপ্তি ও গায়ের রং এ দুটি হিসাবে ধরিলে নাকি আর কোন নামেই ওর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়না।

কুকুর ছানা প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ। অজিত ও দিলীপ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাড়ার লোকে তাহাদের বলে রাম লক্ষ্মণ, লব কুশ, কেহ কেহ বা বলে হরিহরাত্মা। পাড়ার বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার মিঃ পাল বলেন যে কংক্রিটের গাঁথুনী ফাট্‌তে পারে কিন্তু ওদের বন্ধুত্ব অকাট্য। উচ্চ কুলীন বংশসম্ভূত কুকুর ছানাটিকে দিলীপ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত, আর্জ্জেন্টিনা, বলিভিয়া প্রভৃতি রাজ্যের কন্‌সালের মোটর গাড়ী তাহার বাড়ীর দরজায় আনাগোনা করিয়াছে, কিন্তু দিলীপ টাকার লোভে টলে নাই, কুকুর ছানাটি অজিতকে দান করিয়াছে। লোকে বলিল—এমন যে হবেই আমরা জানতাম। আশ্চর্য্য, লোকে আগে থেকে সব কথাই জানে—তবু অদৃষ্ট বলিয়া এখনো কেন যে কিছু আছে ইহাই—সংসারের একমাত্র আশ্চর্য্য ব্যাপার।

॥ ২ ॥

সংসারের কোন্ বিদ্বেষটা চিরস্থায়ী? ইঙ্গ-সোভিয়েট বিদ্বেষ মৈত্রীতে পরিণত হয়, রুশ-জার্ম্মাণ দ্বন্দ্বও চিরকাল থাকেনা, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর কলহ, সব কলহের পুরাতন এবং সব কলহের মূল তাহাও মেটে। কাজেই ফেনী ও কালো জোনাকের কলহ যে মিটিয়া যাইবে, বিস্ময়ের কি আছে! মানুষ না হইলেও তাহারা মানুষের পার্শ্বচর বটে তো। কিন্তু কলহটা একদিনে মেটে নাই বা সরাসরিও মেটে নাই। কতকগুলি স্বাভাবিক স্তর পার হইয়া এখন কুকুর বিড়াল মৈত্রীতে পরিণত হইয়াছে। প্রথম কিছুদিন গেল যুদ্ধমান বা বেলিজিরান্সি অবস্থা, তারপরে সাক্ষাৎ যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধসম বা নন বেলজিরান্সি, তারপরে আর্মড নিউট্রালিটি, নিউট্রালিটি কো-একজিসটেন্স অতিক্রম করিয়া এখন পুরাপুরি ঘনিষ্ঠ মিতালির পর্ব্ব চলিতেছে।—রাজনীতি কে কাহার কাছে শিখিয়াছে? পশুর কাছে মানুষ, মানুষের কাছে পশু?

এখন দুটিতে সদা-সর্বদা একত্র উঠা-বসা, খাওয়া-শোয়া, ভ্রমণ ও বিহার। একই কাঠের বাক্সের ভিতরে দু'জনে সারারাত শুইয়া থাকে। পাড়ার ছেলেরা কালো জোনাককে বিরক্ত করিলে ফেনী ফ্যাশ শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করে। ফেনীর ভাতের থালায় শালিখ ও কাক লোভ প্রকাশ করিলে কুকুরটা থাবা তুলিয়া আক্রমণ করে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে,

কালো জোনাকের বরাদ্দ দুধে ফেনী বা ফেনীর সংগৃহীত মাছের কাঁটায় কালো জোনাক কখনো অন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করে না। আর দুটিতে, ফেনী আগে কালো জোনাক পিছনে বাড়ীময় ও বাড়ীর আশে পাশে ঘুড়িয়া বেড়ায়। তাহাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া পাড়ার লোকে বলে যতসব কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড!

কিন্তু এমন চিরকাল ছিল না। ফেনী নবাগতকে সহিতে পারিত না, তাহার দুধ চুরি করিয়া খাইত, তাহার বিছানা ছিঁড়িয়া ফেলিত, এমন কি সুরমার অনবধানে তাহাকে আক্রমণ করিত। তাহাদের কলহের শব্দে (শব্দটা ফেনীর কণ্ঠেই অধিক) প্রতিবেশীরা অস্থির ছিল। সকলে বলিত যতসব কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড!

আগে দিলীপ আসিলে একদিকে ফেনী যেমন আক্রোশ করিত, কালো জোনাক তেমনি তাহার কাছে কাছে ঘুরিত। এখন দিলীপ আসিলে কাহারো ভাব-বৈকল্য ঘটে না। দিলীপ যখন খবরের কাগজ পড়ে কালো জোনাক পায়ের কাছে গুঁড়িসুড়ি হইয়া শুইয়া থাকে, ফেনী সতর্ক হইয়া পাহারা দেয় কেহ না শান্তি ভঙ্গ করে।

দিলীপ বলে, বৌদি কুকুরটা দেখছি আপনার খুব বশ মেনেছে!

কি ক'রে জানলেন?

আমাকে আর চিনতেই পারে না দেখছি।

সুরমা মনে মনে খুশী হয়, ভাবে আহা অজিত যদি এমনি বশ মানিত! সব পত্নীরই বিশ্বাস স্বামী তাহার যথেষ্ট বশ নয়।

দিলীপ বলে, এখন ফেনী আর কালো জোনাকে খুব ভাব দেখছি।

হবে না কেন দিলীপ বাবু, আপনাদের বন্ধুত্বের আদর্শ সমুখে দেখছে তো।

দিলীপ হাসিয়া বলে—যা বলেছেন বৌদি, আমাদের এঞ্জিনিয়ার পাল বলেন যে আমাদের মতোই ফেনী আর কালো জোনাকের সম্বন্ধ একেবারে 'অকাট্য'।

বেশ দিন চলিয়া যায়।

॥ ৩ ॥

সংসারে কোন্ সম্বন্ধটা চিরস্থায়ী ? জার্মাণ-সোভিয়েট মৈত্রী লঙ্ঘন করে হিটলার, ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী শিথিল করে হিটলারের বিমান। সংসারে সবই সম্ভব, এমন কি দিলীপ অজিতের আদর্শ বন্ধুত্বও অবশেষে ক্ষুণ্ণ হইল। পাড়ার লোকে বলিল, এ যে শেষে রাম-লক্ষ্মণের লড়াই, কেহ বলিল এমন না হ'লে আর কলির শেষ কেন বলেছে। এঞ্জিনিয়ার পাল বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, কংক্রিটের গাঁথুনীতেও দেখছি ফাটল ধরলে !

ব্যাপারটার সূত্রপাত একটি বাড়ীভাড়া প্রসঙ্গে। দিলীপ ও অজিত দু'জনেই থাকে ভাড়া বাড়ীতে, ভাড়া যেমন বেশী, স্থান তেমনি অকুলান। এমন সময়ে একটি স্বল্প ভাড়ার অধিক স্থানের বাড়ী পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল, দিলীপ ও অজিত দু'জনেই দাঁড়াইল প্রার্থী। তারপরে কোন সূত্রে, বাহিরের কোন উত্তেজনায়, ভিতরের কোন প্ররোচনায় উভয়ের প্রার্থনায় লাগিল সঙ্ঘাত। সঙ্ঘাত ক্রমে গুপ্ত সংঘর্ষে ও পরে প্রকাশ্য কলহে পরিণত হইল, সে ইতিহাস মনস্তত্ত্বজ্ঞদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও এ কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক। আমাদের পক্ষে প্রয়োজন তাহাদের কলহের পরিণাম। একদিন প্রকাশ্য রাজপথে দিলীপ ও অজিতের দলবলে সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল এবং তারপর হইতে চক্ষুলজ্জার আবরণটুকু সম্পূর্ণ খসিয়া পড়িয়া গেল। পাড়ার ছেলেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া পথে-ঘাটে যত্র-তত্র বিতণ্ডা ও মারামারি করিতে থাকিল। বৃদ্ধেরা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত এ যে কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড হ'য়ে উঠল দেখছি।

পশু যদি সত্যই মানুষের গুণগ্রাহী হইত তবে দিলীপ ও অজিতের বিচ্ছেদ অজুহাত অবলম্বন করিয়া ফেনী ও কালো জোনাকেরও বিবাদে মাতিয়া ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক তাহার বিপরীত হইল। তাহারা পাড়ার বিবাদের সঙ্কেত তো গ্রহণ করিলই না, বরঞ্চ প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মানব-চরিত্রের প্রেরণায় অজিত-প্রদত্ত কুকুরটার প্রতি সুরমা অনাদর প্রকাশ করিতে শুরু করিল, তাহার খাদ্যের বরাদ্দ কমাইয়া দিল, মাঝে মাঝে ইঙ্গিত ও আচরণের দ্বারা ফেনীকে কুকুরটার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল

না, নিজ খাদ্যের অংশ ফেনী কুকুরটার সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইত আর সর্বদা দু'জনে অধিকতর ঘনিষ্ঠতায় চলাফেরা করিত। বিড়ালের অকৃতজ্ঞতায় ও কুকুরের বেহায়াপনায় বিরক্ত হইয়া সুরমা মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিত, যতসব কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড!

একদিন ব্যাপার চরমে উঠিল। পাড়ায় ফুটবল ম্যাচ ছিল। ম্যাচে হারজিত আছে, তেমনি আবার মারধোরও আছে। রেফারীর একটা সিদ্ধান্ত লইয়া কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই রেফারীর সিদ্ধান্ত বিস্মৃত হইয়া দিলীপ ও অজিতের বিবাদরূপে আত্ম-প্রকাশ করিল। খেলার মাঠে দুই দলের লোকই ছিল আর উপলক্ষ্য তো অনেকদিন হইতেই প্রস্তুত, কাজেই বিবাদের রূপান্তরে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিল ঘুসি চড় চলিবার পরে অহিংস তূণের শেষ অস্ত্র ইট-পাটকেল বাহির হইল। দিলীপ ও অজিত খেলার মাঠে ছিলনা, মারামারি হইতেছে শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। এম্বুলেন্স খবর পাইয়া যখন আসিল, দেখা গেল আহতের সংখ্যা ৮।১০ জন, তন্মধ্যে দিলীপ ও অজিত দু'জনেই আছে। কতক হাসপাতালে আর বাকি সকলে নিজ নিজ বাড়িতে চলিয়া গেলে পাড়া শান্ত হইল। বৃদ্ধের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় হইতে ফিরিবার পথে মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল —যতসব কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড হ'য়ে উঠল।

অজিত আহত হইয়াছে শুনিয়া দিলীপের একমাত্র ও যোগ্যতম প্রতিনিধি কুকুরটার উপরে সুরমা গিয়া পড়িল, প্রাণপণে ঠেঙ্গাইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কুকুর নিশ্চয়ই মানুষ নয়, সেটা আদৌ বিরক্তি প্রকাশ বা বিদ্রোহ করিল না, সুরমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া মাথা ঘসিতে ও লেজ নাড়িতে লাগিল, সুরমা যেন কতই আদর করিতেছে। ওদিকে বিড়ালটা'র কাণ্ড দেখো। তাহার উচিত ছিল প্রভুর লাঞ্ছনায় উত্তেজিত হইয়া প্রভুপত্নীকে সাহায্য করা, কিন্তু সেইরূপ কিছুই করিল না। সঙ্গীর সমূহ বিপদে বিব্রত হইয়া করুণ আর্তনাদে সে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও যখন সুরমার উদ্যত যষ্টিহাত নিরস্ত হইল না, তখন ফেনী এক কাণ্ড করিয়া বসিল (আঃ ছি ছি) লাফাইয়া উঠিয়া তাহার হাতে এমন জোরে আঁচড়াইয়া দিল যে লাঠি ফেলিয়া সুরমা পালাইবার পথ পাইল না। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বিড়ালের কৃতঘ্নতা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, যতসব কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড!

তখন কালো জোনাক উঠিয়া দাঁড়াইল, ফেনীর সজল-চক্ষু তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, খুব লাগিয়াছে কি! উত্তরে কালো জোনাকের স্নিগ্ধ চক্ষু বলিল, হাতটায় অত জোরে না আঁচড়াইলেই পারিতে, ঐ হাতেই যে দু'বেলা খাইতে দেয়। হয়তো আরো কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর বিনিময় তাহাদের মধ্যে হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব— কারণ, সে সব তো কুকুর-বিড়ালের কাণ্ড!

— শেষ —